৪৫তম বিসিএস লিখিত ফুল কোর্স

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

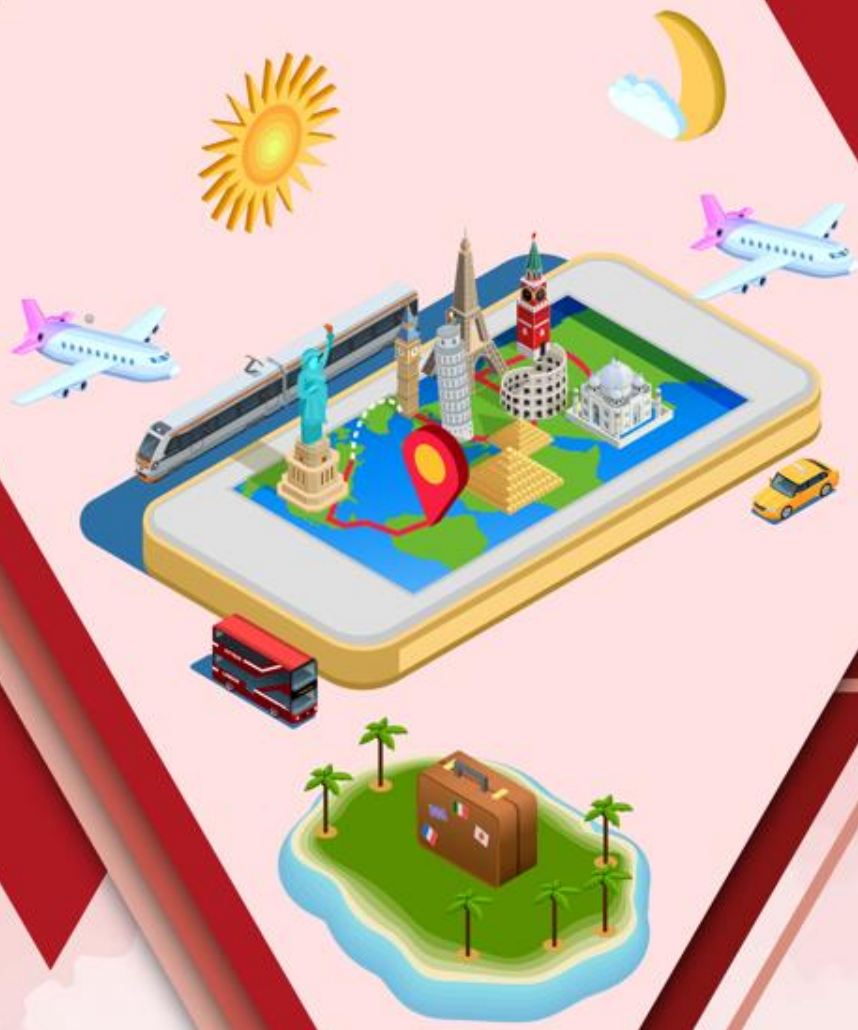

লেকচার: ০৯

টপিক:

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী প্রধান সমস্যা ও সংঘাত:

মধ্যপ্রাচ্য সংকট (জেরুজালেম, ইরান, সিরিয়া, ইয়ামেন, কুর্দিস্তান, সৌদি-ইরান সংঘাত)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী প্রধান সমস্যা ও সংঘাত:

(i) মিয়ানমারে সেনা অভ্যুত্থান। (ii) আজারবাইজান ও আর্মেনিয়া সংকট, (iii) ভূমধ্যসাগর সংকট (iv) বাণিজ্য যুদ্ধ এবং সামসময়িক ইস্যু।

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
09666775566
www.uttoron.academy

মধ্যপ্রাচ্য সংকট

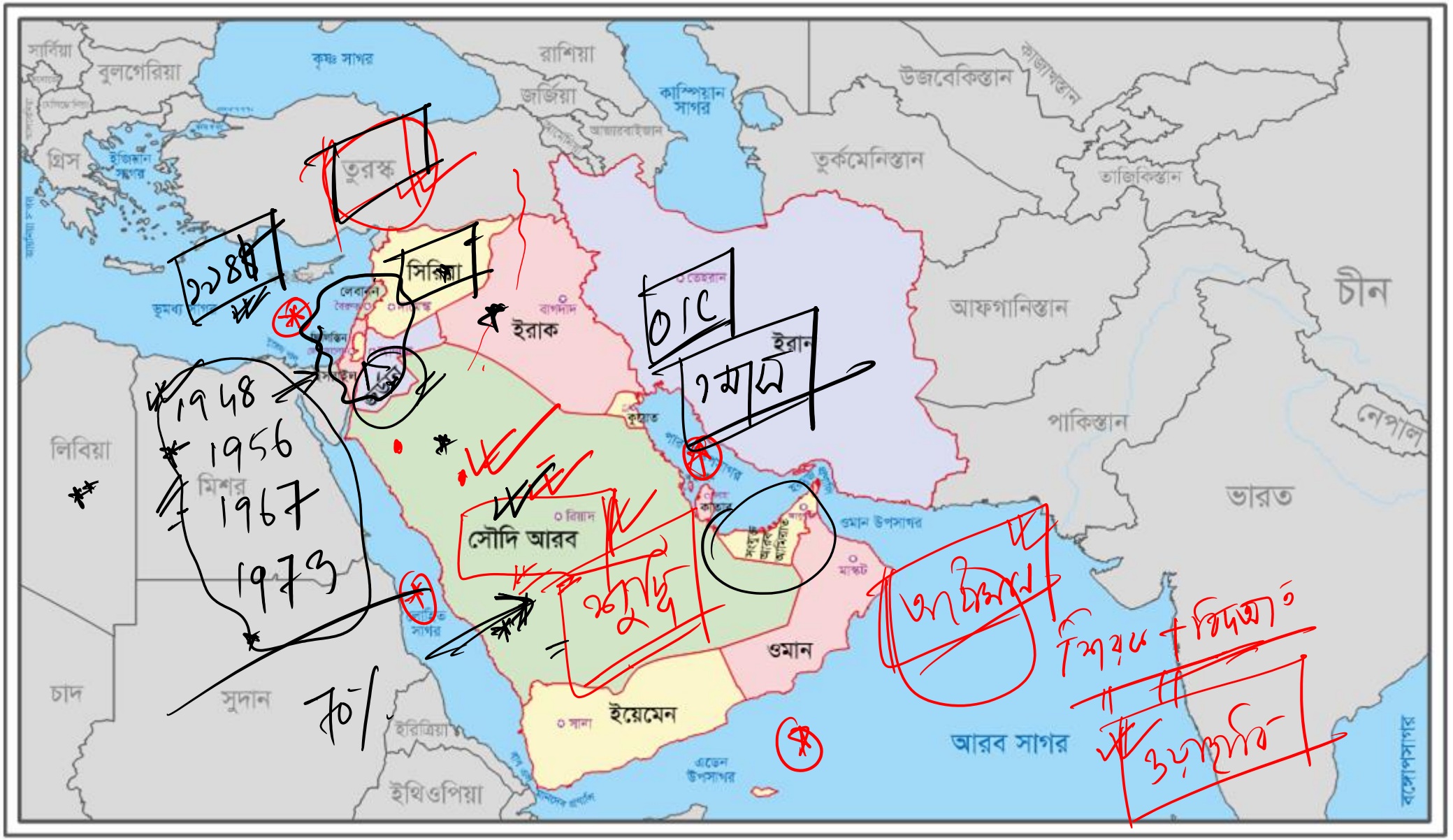

কৃষ্ণ সাগর
রাশিয়া
বুলগেরিয়া
জর্জিয়া
কাস্পিয়ান সাগর
উজবেকিস্তান
আজারবাইজান
তুর্কমেনিস্তান
গ্রিস
ইজিয়ান সাগর
তুরস্ক
তাজিকিস্তান
সিরিয়া
লেবানন
বাগদাদ
তেহরান
ইরাক
ইরান
আফগানিস্তান
চীন
ভূমধ্য সাগর
কুয়েত
পাকিস্তান
নেপাল
লিবিয়া
মিশর
রিয়াদ
সৌদি আরব
ভারত
ওমান উপসাগর
মাস্কাট
লোহিত সাগর
ওমান
চাদ
সুদান
ইরিত্রিয়া
সানা
ইয়েমেন
আরব সাগর
এডেন উপসাগর
ইথিওপিয়া
বঙ্গোপসাগর

জেরুজালেম সংকট

ইহুদি, খ্রিস্টান ও ইসলাম-এই তিনটি ধর্মেরই পবিত্র স্থান বর্তমান জেরুজালেম তথা ফিলিস্তিন ভূখণ্ডটি। তাই এসব ধর্মাবলম্বীদের নিকট এর একটি আলাদা মর্যাদা রয়েছে। পবিত্র আল-আকসা মসজিদের অবস্থান ও হজরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মেরাজ গমনের স্থান হিসেবে মুসলমানদের নিকট জেরুজালেমের ধর্মীয় গুরুত্ব অপরিসীম। অপরদিকে ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থে রয়েছে, ঈশ্বর স্বয়ং পথ দেখিয়ে আব্রাহামকে ফিলিস্তিনে নিয়ে এসেছেন এবং ফিলিস্তিনকে আব্রাহামের বংশধরদের বসবাসের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এরপর থেকেই ইহুদিরা ফিলিস্তিনকে ঈশ্বরের দান মনে করে এক মহাপুণ্যস্থান হিসেবে বিবেচনা করে আসছে। এছাড়া ফিলিস্তিনে ইহুদি রাজা সলোমন কর্তৃক ধর্মমন্দির নির্মাণ ও যুগে যুগে বহু ইহুদি মহাপুরুষের আবির্ভাবের ফলে ফিলিস্তিন ইহুদিদের নিকট ধর্মীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও পবিত্র স্থানে পরিণত হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিতাড়িত ইহুদিরা সংঘবদ্ধভাবে ফিলিস্তিনে ফিরে আসার উদ্দেশ্যে কর্মতৎপরতা চালাতে থাকে। তারা ফিলিস্তিনের উপর তাদের ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক দাবি উত্থাপন করে।

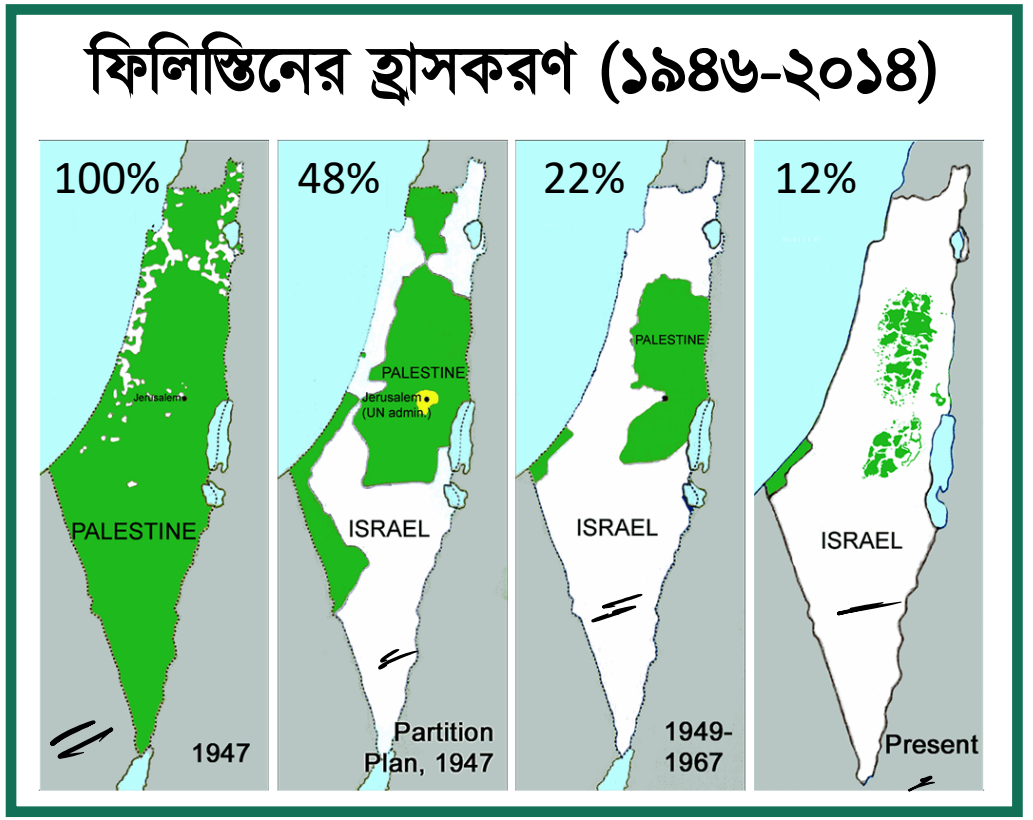

১৯১৭ সালের বেলফোর ঘোষণার মাধ্যমে ১৯৪৮ সালে মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জেরুজালেম সংকটের সূচনা হয়েছিল। ফিলিস্তিনের উপর আরবদের দাবির ভিত্তি ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক। কিন্তু ফিলিস্তিন সমস্যা সমাধানে উভয় পক্ষের দাবিসমূহ চুলচেরা বিশ্লেষণ করা বাস্তবে সম্ভব নয়। কেননা ধর্মীয় পবিত্রতার মাত্রা নিরুপণ করা যায় না। বসবাস ও দখলদারিত্বের দিক থেকে আরবরা এগিয়ে থাকলেও শুধুমাত্র এর উপর ভিত্তি করে ইহুদিদের দাবিকে পুরোপুরি নাকচ করা যায় না। অন্যদিকে, কোনো স্থান থেকে বিতাড়িত হওয়ার প্রায় দুই হাজার বছর পর পুনরায় সেই স্থানের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি বিশ্ব ইতিহাসে একটি নজিরবিহীন ঘটনা। ফলে ইসরায়েল-ফিলিস্তিন দ্বন্দ্ব বিশ্বনেতাদের সামনে এক অভিনব সমস্যা হিসেবে হাজির হয় যা সমাধানে কোনো অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত তাদের কাছে ছিল না।

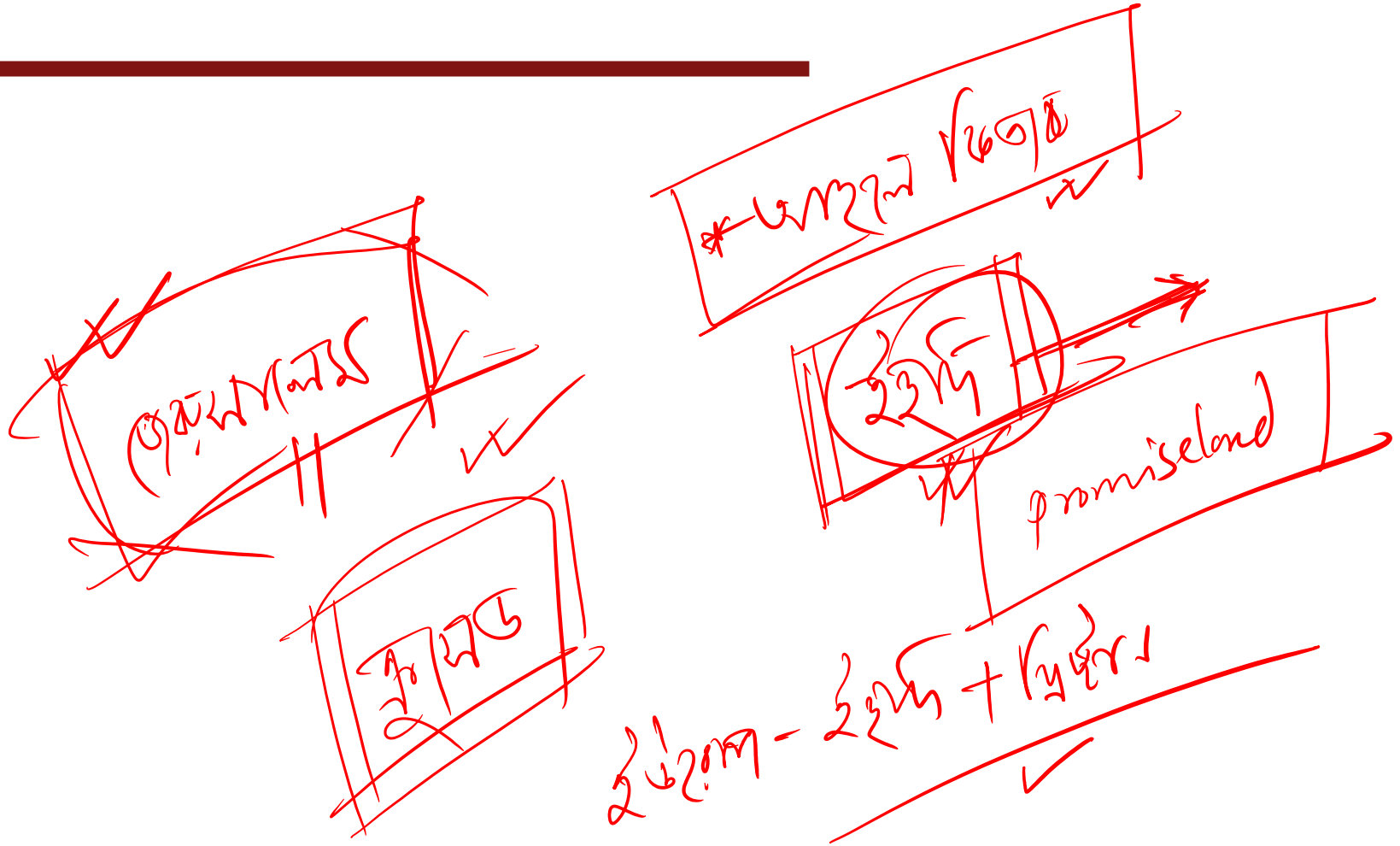

জেরুজালেম সংকট

শান্তি প্রতিষ্ঠায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

১৯৭৩ সালে জেনেভায় শান্তি আলোচনার শুরু হয়। এর মাধ্যমে ১৯৭৮ সালে স্বাক্ষরিত হয় ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি।

- **ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি:** আরব অধ্যুষিত এ অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭৮ সালে মিশর ও ইসরায়েল ঐতিহাসিক ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি স্বাক্ষর করে। এতে মিশর ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দেয়। এর মাধ্যমে মিশর সিনাই উপত্যকা ফিরে পায়। কিন্তু আরব দেশগুলোর সাথে মিশরের সম্পর্কে ফাটল ধরে।

- **অসলো শান্তি চুক্তি:** তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের মধ্যস্থতায় ১৯৯৩ সালে Palastine Liberation Organization (PLO), [যা ১৯৮৮ সালে গাজা ও পশ্চিম তীর নিয়ে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার নিয়ে গঠিত হয়] ও ইসরায়েলের মধ্যে ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

এতে PLO ও ইসরায়েল একে অপরকে স্বীকৃতি দেয় এবং ফিলিস্তিনি অধ্যুষিত এলাকায় PLO এর নেতৃত্বে ফিলিস্তিনি স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

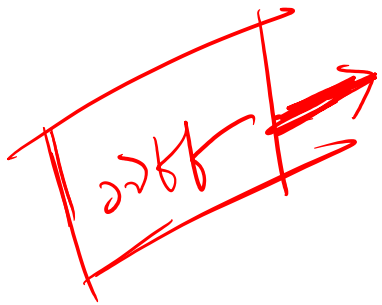

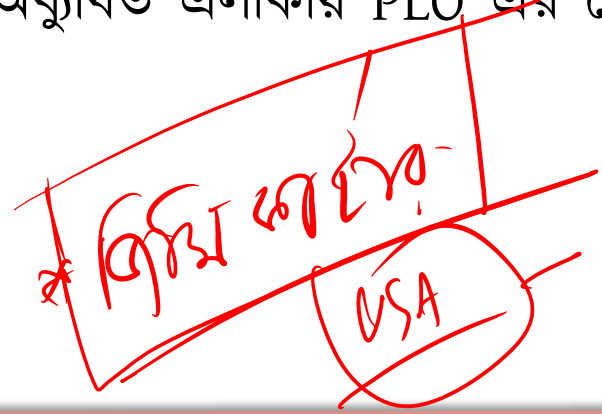

জেরুজালেম সংকট

- **উই রিভার চুক্তি:** ১৯৯৮ সালে PLO প্রধান ইয়াসির আরাফাত ও ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর মধ্যে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিকে ভূমির বিনিময়ে শান্তি চুক্তিও বলা হয়। তবে কট্টরপন্থি ইহুদিরা শুরু থেকেই এ চুক্তির বিরোধিতা করছে।

ফিলিস্তিন অঞ্চলের বিভক্তি:

ফিলিস্তিন অঞ্চলকে বর্তমানে ৩ ভাগে বিভক্ত করা যায়।

- ✓ **Area-A:** এখানে ফিলিস্তিনি কর্তৃত্ব রয়েছে যা মাত্র ১১ ভাগ এলাকা।
- ✓ **Area-B:** এর অন্তর্ভুক্ত ২৮ ভাগ এলাকা যেখানে কর্তৃত্ব রয়েছে ফিলিস্তিন ও ইসরায়েলের যৌথ প্রশাসনের।
- ✓ **Area-C:** ৬১ ভাগ এলাকা, যেখানে ইসরায়েলি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

২০০৭ সালে হামাস ও ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের মাঝে বিভক্তি আসে। হামাস ও ফাতাহ আলাদা আলাদা অবস্থান গ্রহণ করে। ফাতাহ-হামাস দ্বন্দ্বকে কাজে লাগিয়েছে ইসরায়েল।

জেরুজালেম সংকট

বর্তমান সংকট

উই রিভার চুক্তি স্বাক্ষরের পর কেটে গেছে ২২ বছর। কিন্তু ইতিহাসে দীর্ঘ সময় ধরে থাকা এ সমস্যার আদৌ কোনো সমাধান হয়নি। শান্তি প্রস্তাব রয়ে গেছে কাগজে কলমে। ইসরায়েলের আগ্রাসী মনোভাব ও দখলিকৃত অঞ্চলে ইহুদি বসতি স্থাপন পরিস্থিতিকে বারবার জটিলতার দিকে ঠেলে দিয়েছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে নিম্নোক্ত সাম্প্রতিক ঘটনা।

- **১. জেরুজালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি:** ২০১৭ সালের ৬ ডিসেম্বর তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জেরুজালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এর মাধ্যমে পশ্চিম তীর, গাজাসহ বিভিন্ন স্থানে ফিলিস্তিনিরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং ট্রাম্পের ঘোষণা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে। ফিলিস্তিনে আবারো নতুন করে ইন্তিফাদা শুরু হয় এবং সংকট নতুন আকার ধারণ করে।

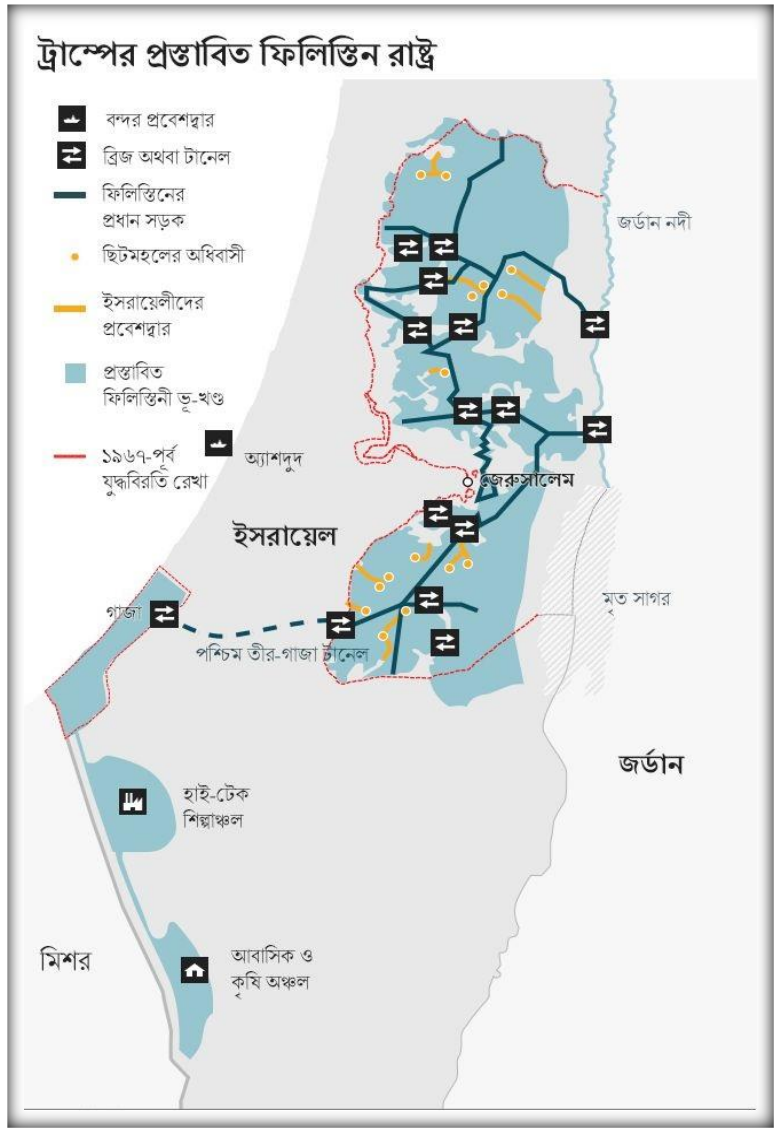

জেরুজালেম সংকট

- **মার্কিন দূতাবাস তেল আবিব হতে জেরুজালেমে স্থানান্তর:** ট্রাম্প প্রশাসন ২০১৭ সালেই মার্কিন দূতাবাস তেল আবিব হতে জেরুজালেমে স্থানান্তর করার নির্দেশ দেন ফলে উত্তেজনা চরমে পৌঁছায়। হামাস যুক্তরাষ্ট্রের এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে।

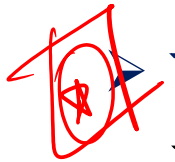

- **ডিল অব দ্য সেঞ্চুরি:** ফিলিস্তিন সংকটের সমাধানে দীর্ঘদিন ধরে দুই রাষ্ট্র ফর্মুলা নিয়ে আলোচনা চলছিল। কিন্তু বিগত ট্রাম্প প্রশাসন এ ফর্মুলাকে সমর্থন করেননি। উল্টো ফিলিস্তিনিদের অস্তিত্ব বিলীনকারী ষড়যন্ত্রমূলক একটি পরিকল্পনা তৈরি করে। এ চুক্তিটি ডিল অব দ্য সেঞ্চুরি নামে ঘোষিত এবং এতে স্বাক্ষর করে ইসরায়েল ও মার্কিন প্রশাসন। এতে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের কথা অস্বীকার করা হয়। ফলে সংকট আরো ঘনীভূত হয়।

  আরব দেশগুলো এই চুক্তির পরিবর্তে সালভেশন অব দ্য সেঞ্চুরি নামক পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এটি ফিলিস্তিনিদের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় তাদের উপর আরোপিত নির্যাতন নিপীড়নের অবসানকল্পে আরব দেশগুলোর গৃহীত একটি দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মহাপরিকল্পনা।

জেরুজালেম সংকট

- **আব্রাহাম অ্যাকর্ডস:** ২০২০ সালের আগস্ট মাসে ইসরায়েল ও সংযুক্ত আরব আমিরাত এর মধ্যে একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উপসাগরীয় দেশ হিসেবে আরব আমিরাত প্রথম দেশ, যে ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছে। কিছুদিন পর বাহরাইনও ইসরায়েলের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে। এর আগে ১৯৭৯ সালে মিশর ও ১৯৯৪ সালে জর্ডান ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে।

  সৌদি আরব ও ওমান আরব আমিরাতের পথ অনুসরণ করতে পারে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

  এ ধরনের চুক্তি ফিলিস্তিনিদের পক্ষে আরব বিশ্বের দীর্ঘদিনের শক্ত অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়বে।

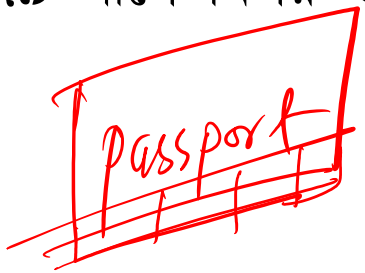

- **হামাস-ইসরায়েল যুদ্ধ:** এপ্রিল ২০২১ সালে পবিত্র রমজান মাসের প্রথম রাতে জেরুজালেমে আল আকসা মসজিদের দামেস্ক গেট বন্ধ করায় ফিলিস্তিনি মুসলমানরা বিক্ষোভ করলে ইসরায়েলি পুলিশ হামলা করে। এ সময় ইসরায়েলি বাহিনী মসজিদের ভিতরে প্রবেশ করে মুসল্লিদের ওপর নির্যাতন চালায়। এরপর গাজা উপত্যকার নিয়ন্ত্রণকারী গোষ্ঠী হামাসের সাথে ইসরায়েলের ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। হামাস রকেট হামলা চালালে ইসরায়েল বিমান হামলা শুরু করে। ১১ দিন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ইসরায়েল যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে। যুদ্ধ বিরতি সত্ত্বেও ইসরায়েল মাঝে মাঝে হামলা অব্যাহত রেখেছে। ২০ মে, ২০২১ যুদ্ধবিরতি হয়।

জেরুজালেম সংকট

সংকট সমাধান না হওয়ার কারণ

- **ইসরায়েলের একগুয়ে মনোভাব:** বিভিন্ন সময়ে ইসরায়েল-ফিলিস্তিন শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও ইসরায়েলের একগুয়েমি ও আগ্রাসী মনোভাবের কারণে আজও শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়নি। বরং শান্তি প্রস্তাব কাগজে কলমেই রয়ে গেছে। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ২৪২, ৩৩৮ নং প্রস্তাব অনুযায়ী ইসরায়েলের অধিকৃত আরব এলাকা ফিরিয়ে দেবার কথা। কিন্তু ইসরায়েল সেই সিদ্ধান্ত কখনো কার্যকর করেনি। ৪৭৮ নং প্রস্তাব অনুযায়ী জেরুজালেমে দূতাবাস স্থাপন বন্ধ করার কথা বলা হয় কিন্তু ইসরায়েল এসব মানেনি।

- **যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা:** ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েলের অন্যতম মিত্র ও সহযোগী রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্র। পরোক্ষভাবে যুক্তরাষ্ট্র কখনোই চায়নি ফিলিস্তিন সমস্যার সমাধান হোক। যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন সব সময় ইসরায়েলকে সমর্থন করে গেছে। জাতিসংঘে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল যে, ইহুদিবাদ একটি বর্ণবাদ মতবাদ। ১৯৯২ সালে সেই প্রস্তাব বাতিল ঘোষণা করে আমেরিকা প্রশাসন জাতিসংঘে নতুন প্রস্তাব এনেছিল এবং জাতিসংঘে তা গৃহীতও হয়েছিল। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আনীত ৭০টিরও বেশি প্রস্তাবে যুক্তরাষ্ট্র ভেটো দিয়েছে। জেরুজালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি ও যুক্তরাষ্ট্র তার দূতাবাস তেল আবিব হতে জেরুজালেমে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত পরিস্থিতিকে আরো জটিল করেছে।

জেরুজালেম সংকট

- **জাতিসংঘের ভূমিকা:** ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সমস্যা সমাধানে জাতিসংঘ কার্যকর ভূমিকা গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছে। এখন পর্যন্ত জাতিসংঘ বিবৃতি দিয়েই তাদের দায় সেরেছে। জাতিসংঘ ইসরায়েলকে বাধ্য করার কোনো উদ্যোগ নেয়নি। ফিলিস্তিনে বারবার মানবাধিকার লঙ্ঘনসহ আন্তর্জাতিক আইন বিরোধী বিভিন্ন কার্যক্রম ইসরায়েল পরিচালনা করলেও জাতিসংঘ সেসব বন্ধে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

- **ফিলিস্তিনে অবৈধ বসতি স্থাপন:** ইসরায়েলের আগ্রাসী মনোভাব ও দখলিকৃত অঞ্চলে ইহুদি বসতি স্থাপন পরিস্থিতিকে বারবার জটিলতার দিকে নিয়ে গেছে।

- **'দুই রাষ্ট্র ফর্মুলা' ব্যর্থ:** ফিলিস্তিন-ইসরায়েল সমস্যা সমাধানে দীর্ঘদিন ধরে দুই রাষ্ট্র ফর্মুলা নিয়ে আলোচনা চলছিল। বিগত মার্কিন প্রশাসন এটিকে সমর্থন করলেও ট্রাম্প প্রশাসন এ ফর্মুলাকে সমর্থন করেনি। বরং ইসরায়েলের সাথে 'ডিল অব দ্য সেঞ্চুরি' নামক চুক্তি স্বাক্ষর করে। ফলে সমস্যা আরো জটিল আকার ধারণ করে।

- **আরব দেশগুলোর অন্তঃকোন্দল:** মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় প্রতিটি আরব দেশই কোনো না কোনো বিষয় নিয়ে নিজেদের মধ্যে অন্তঃকোন্দলে বিদ্যমান। ফলে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আরব দেশগুলো সম্মিলিতভাবে কোনো দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছে। ১৯৭৯ সালে মিশর এবং ১৯৯৪ সালে জর্ডান ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে। আগস্ট ২০২০ এ ইসরায়েল ও সংযুক্ত আরব আমিরাত এর মধ্যে 'আব্রাহাম অ্যাকর্ড' নামক শান্তি চুক্তি হয়। বাহরাইন এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। ফলে ফিলিস্তিনিদের ব্যাপারে আরব দেশগুলোর এক ধরনের উদাসীন মনোভাব তৈরি হয়েছে এবং সংকটের সমাধান অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

জেরুজালেম সংকট

সংকট সমাধানে করণীয়

- ✓ জাতিসংঘের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ
- ✓ যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা গ্রহণ
- ✓ আরব দেশগুলোর বিভক্তি দূরীকরণ
- ✓ ইসরায়েলের একগুয়ে মনোভাব বর্জন করা
- ✓ ইহুদি কর্তৃক অবৈধ বসতি স্থাপন বন্ধ করা
- ✓ প্রয়োজনে ইসরায়েলের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা

ফিলিস্তিন সংকট এমন এক সংকট, যার সূচনা প্রায় ৭৫ বছর আগে। পৃথিবীতে আর কোনো সমস্যা নেই, যার সাথে ফিলিস্তিন সমস্যা তুলনা করা যায়। বছরের পর বছর ধরে এই সমস্যা চলে আসছে। কিন্তু বিশ্ব সম্প্রদায় এ সমস্যার কোনো সমাধান করতে পারেননি। এ সংকটের মাত্রা ও গভীরতা এত বেশি যে পশ্চিমা পণ্ডিত অধ্যাপক হান্টিংটন এ সংকটকে কেন্দ্র করে তাঁর বিখ্যাত তত্ত্ব The Clash of Civilization বা সভ্যতার দ্বন্দ্ব উপস্থাপন করেছেন।

ইরান সংকট

আজারবাইজান
আর্মেনিয়া
কাস্পিয়ান সাগর
তুর্কমেনিস্তান
তেহরান
ইরান
ইরাক
আফগানিস্তান
কুয়েত
পারস্য উপসাগর
পাকিস্তান
সৌদি আরব
বাহরাইন
কাতার
সংযুক্ত আরব আমিরাত

ইরান সংকট

ইরানের সাথে পারমাণবিক চুক্তি

ইরানের পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি ঠেকাতে পশ্চিমা বিশ্ব তথা যুক্তরাষ্ট্র বহু বছর ধরে দেশটির ওপর বাণিজ্য অবরোধ দিয়ে রেখেছিল। এতে কাজ না হওয়ায় ২০১৫ সালে ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে একটি সমঝোতা চুক্তি হয়। চুক্তিটির আনুষ্ঠানিক নাম Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) বা 'সম্মিলিত সর্বাঙ্গীন কর্মপরিকল্পনা', স্বাক্ষরিত হয় ২০১৫ সালের ১৪ জুলাই। ইরানের সাথে চুক্তিটিতে স্বাক্ষর করে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী পাঁচ সদস্য যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া এবং চীন। সাথে ছিল ইউরোপের আরেক শক্তিধর দেশ জার্মানিও। তাই এই চুক্তিটিকে 'ইরানের সাথে P5+1 এর পারমাণবিক চুক্তি' বলা হয়। চুক্তিটি সর্বসম্মতভাবে অনুমোদন করে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন।

ইরান সংকট

চুক্তির প্রেক্ষাপট

আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থা (IAEA) এর অনুসন্ধান অনুযায়ী, ইরান ২০০৩ সাল থেকে শুরু করে ২০০৯ সাল পর্যন্ত পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণের চেষ্টা করেছিল। এ সময়ে তারা শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের জন্য যতটুকু প্রয়োজন, তার চেয়েও অনেক বেশি লক্ষ্যমাত্রায় ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করে এবং প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি পারমাণবিক কেন্দ্র স্থাপন ও ভারী পানি, ইউরেনিয়াম ও প্লুটোনিয়াম মজুদ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ অনুযায়ী, ইরান ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ এমন পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল যে, তারা চাইলে মাত্র দুই থেকে তিন মাসের মধ্যে পারমাণবিক বোমা তৈরির সক্ষমতা অর্জন করতে পারত। সেই থেকেই ইরানের উপর নানা ধরনের অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ শুরু হয়। কট্টরপন্থি ইরানি প্রধানমন্ত্রী আহমেদিনেজাদের সময়ে ইরান পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে এগুতে থাকে। ক্ষমতার রদবদলে মধ্যমপন্থি হাসান রুহানি ক্ষমতায় আসলে ২০১৩ সালে এসে দীর্ঘ ২৯ বছর পর যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে প্রেসিডেন্ট পর্যায়ে টেলিফোন সংলাপ হয়। ফলে ইরান ও পশ্চিমের মধ্যে সম্পর্কের বরফ গলার এবং মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা প্রশমনের ক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক অগ্রগতি অর্জনের সম্ভাবনা দেখা দেয়। তারই ধারাবাহিকতায় ২০১৫ সালে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়।

ইরান সংকট

যা যা ছিল চুক্তিতে

- ✓ ইরান পরবর্তী ১৫ বছর পর্যন্ত ৩.৬৭ শতাংশের বেশি ইউরেনিয়ামসমৃদ্ধ করতে পারবে না ।
- ✓ ইতোমধ্যেই সমৃদ্ধকৃত ১০ হাজার কেজি ইউরেনিয়ামের মজুদের মধ্যে মাত্র ৩০০ কেজি রেখে অবশিষ্ট ইউরেনিয়াম পারমাণবিক ক্ষমতাধর অন্য কোনো দেশের (রাশিয়া) কাছে হস্তান্তর করতে হবে।
- ✓ পরবর্তী ১৫ বছর পর্যন্ত ইরান এই ৩০০ কেজির চেয়ে বেশি ইউরেনিয়াম মজুদ রাখতে পারবে না।
- ✓ ইরানের ২০ হাজার পারমাণবিক কেন্দ্রের মধ্যে মাত্র ৫ হাজার ৬০টি কেন্দ্র পরবর্তী ১০ বছর পর্যন্ত সক্রিয় রাখা যাবে।
- ✓ সীমিত পারমাণবিক চুল্লিগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় ভারী পানি রেখে বাকি সব ভারী পানি আন্তর্জাতিক বাজারে ন্যায্যমূল্যে বিক্রি করে দিতে হবে এবং পরবর্তী ১৫ বছর পর্যন্ত নতুন কোনো ভারী পানি উৎপাদন করা যাবে না।
- ✓ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাতিসংঘ এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইরানের ওপর থেকে বিভিন্ন ধরনের অবরোধ উঠিয়ে নিয়ে ইরানকে দেশগুলোর সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন এবং দেশগুলোর অর্থনৈতিক ও ব্যাংকিং সুবিধা ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করে দেবে।
- ✓ জ্বালানি তেলসহ ইরানের বিভিন্ন পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে বিনা শর্তে বিক্রি করার সুযোগ দেয়া হবে।

সৌদি-ইরান সংঘাত

শিয়া-সুন্নি বিরোধ

সৌদি আরব ও ইরানের মধ্যে সংঘাতের পিছনে আরেকটি যে ব্যাপার কাজ করে তা হলো শিয়া-সুন্নি বিরোধ। সৌদি আরব ও ইরান ইসলাম ধর্মের মূল দুটো শাখা যথাক্রমে সুন্নি ও শিয়া অনুসারী। ইরান শিয়া মুসলিম বিশ্ব এবং অন্যদিকে সৌদি আরব সুন্নি মুসলিম জগতের শীর্ষ শক্তি হিসেবে বিবেচিত। ১৯৭৯ সালে ইরানে ইসলামি বিপ্লবের পর থেকে ইরানের বাইরেও শিয়া শাসনতন্ত্রের মডেল ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে- এই কারণে সুন্নি সৌদি আরবের সাথে তাদের মতাদর্শিক বিরোধ রাষ্ট্র দু'টিকে সংঘাতের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

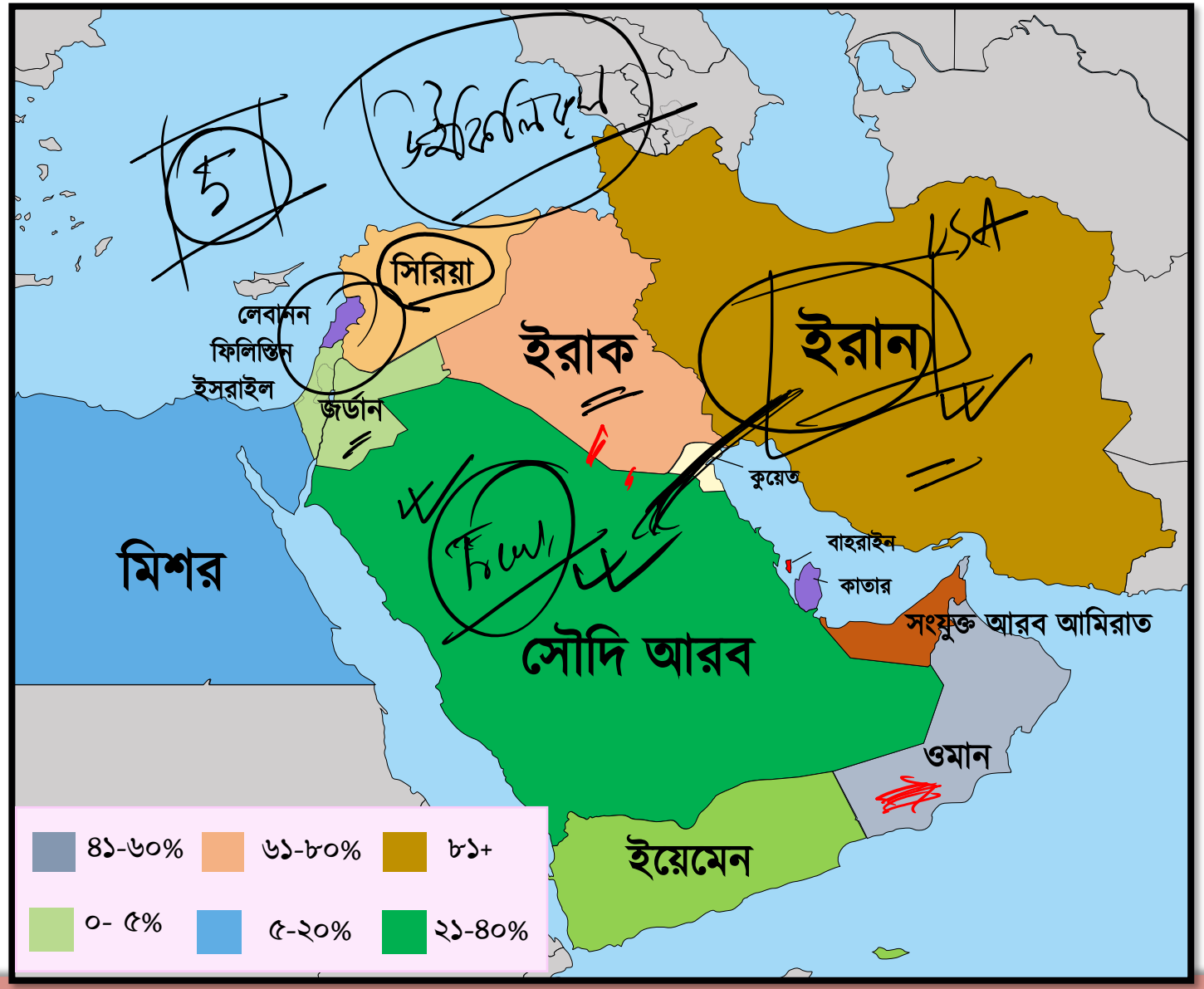

সৌদি-ইরান সংঘাত

সিরিয়া, ইয়েমেন ও লেবাননে প্রক্সি যুদ্ধ

সৌদি আরব ও ইরান এখন পর্যন্ত সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়লেও তারা আঞ্চলিক নানা সংঘর্ষে বিরুদ্ধ পক্ষগুলোর হয়ে পর্দার পেছন থেকে লড়াই করছে। যেমন সিরিয়াতে সেখানে প্রেসিডেন্ট আসাদের বিরোধী বিভিন্ন বিদ্রোহী গ্রুপকে সমর্থন দিয়ে আসছিল সৌদি আরব, কিন্তু সিরিয়ার সরকারি বাহিনী রাশিয়া ও ইরানের সাহায্য নিয়ে তাদেরকে হটিয়ে দিতে সমর্থ হচ্ছে। অন্যদিকে সৌদি আরব প্রতিবেশী ইয়েমেনের ইরান সমর্থিত হুতি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করছে। লেবাননে ইরানের মিত্র শিয়া মিলিশিয়া গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক গোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণ করছে। অনেক পর্যবেক্ষক মনে করেন, ২০১৭ সালে আঞ্চলিক সংঘাতে হিজবুল্লাহর সম্পৃক্ততার কারণেই নিজেদের সমর্থনপুষ্ট লেবানিজ প্রধানমন্ত্রী সাদ হারিরিকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করে সৌদি আরব।

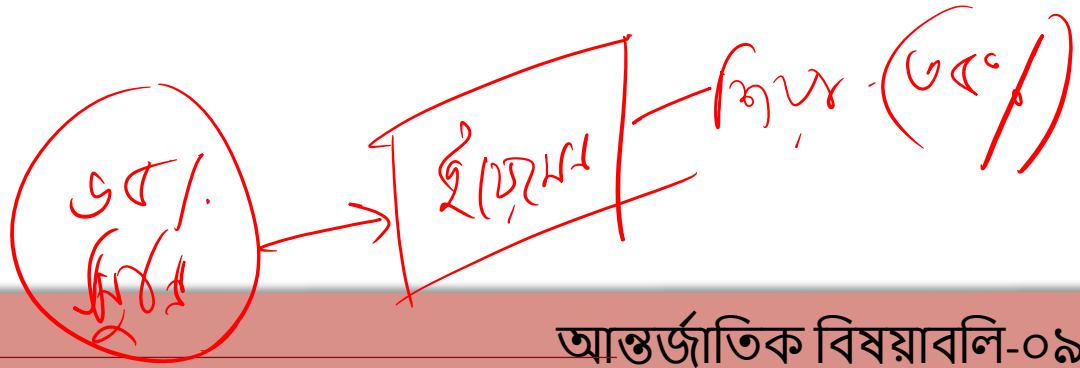

সৌদি-ইরান সংঘাত

সাম্প্রতিক সময়ে সৌদি-ইরান সম্পর্ক

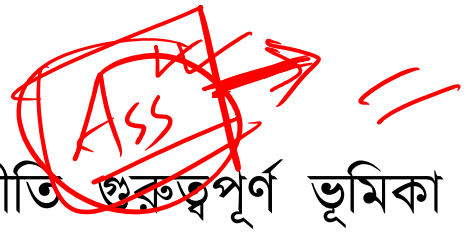

সৌদি-ইরান সম্পর্কের ক্ষেত্রে মার্কিন প্রশাসনের নীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সৌদি আরবের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রদর্শন করতেন। সৌদির ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমানের সাথে তার ছিল অত্যন্ত গভীর সখ্যতা। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক ও সাংবাদিক খাশোগি হত্যায় সৌদি যুবরাজের সম্পৃক্তার প্রমাণ পাওয়া গেলেও যুক্তরাষ্ট্র কোনো পদক্ষেপ তো নেয়ইনি উল্টো তারা সৌদি আরবের সাথে বিশাল অংকের অস্ত্র বিক্রির চুক্তি করে। আর ইরানের প্রতি ট্রাম্পের বিদ্বেষ ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট। ইরানের সাথে ৬ জাতির করা পারমাণবিক চুক্তি থেকে সরে এসে ট্রাম্প ইরানের উপর আরো অর্থনৈতিক অবরোধ চাপিয়ে দেন। ইরানের ২য় সর্বোচ্চ ক্ষমতাবান ব্যক্তি জেনারেল কাশেম সোলায়মানিকেও ড্রোন হামলার মাধ্যমে হত্যা করে ট্রাম্প প্রশাসন। কিন্তু জো বাইডেন ক্ষমতায় এসে সৌদি আরবের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখলেও ইরানের সাথেও দূরত্ব আবার কমিয়ে আনার ঘোষণা দিয়েছেন, পরমাণু চুক্তিতে ফিরে আসার কথা বলেছেন।

সৌদি-ইরান সংঘাত

মধ্যপ্রাচ্যের জন্য আরো আশার সংবাদ এই যে, ২০২১ সালের এপ্রিলে সৌদি ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান পূর্বের বৈরিতা ভুলে ইরানের সঙ্গে 'সুসম্পর্ক' চান বলে জানিয়েছেন। টেলিভিশনে এক সাক্ষাৎকারে যুবরাজ বলেন, "সৌদি আরব চায় না ইরানের সঙ্গে সম্পর্ক আরও জটিল করতে। দিন শেষে ইরান আমাদের প্রতিবেশী দেশ এবং আমরা সবসময়ই তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখার আশা করি। ইরানের সঙ্গে আমাদের সমস্যা হয় তাদের নেতিবাচক আচরণের কারণে। তাদের পরমাণু প্রকল্প, ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপন এবং নিষিদ্ধ ঘোষিত সশস্ত্র বাহিনীকে সমর্থন দেওয়া নিয়েই আমাদের আপত্তি।"ইরানের সাথে সব সংকটের সামাধানের পথ খুঁজে বের করতে সৌদি আরব আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক মিত্রদের সঙ্গে একজোট হয়ে কাজ করছে বলেও জানান বিন সালমান।

২০১৬ সালে শিয়া মতাবলম্বী ধর্মগুরু শেখ নিমর আল নিমরের মৃত্যুদণ্ডকে ঘিরে ইরান-সৌদির তিক্ততার শুরু। সৌদির তরফ থেকে অভিযোগ ছিল ইরানের আশকারায় শিয়ারা রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টির পাঁয়তারা করেছিল। শেখ নিমরের মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের পর তেহরানে সৌদি আরবের দূতাবাসে হামলা করে ইরানিরা এবং ইরান-সৌদি সম্পর্কের অবসান ঘটে।

সৌদি-ইরান সংঘাত

এরপর থেকেই আরবের রাজনীতিতে মুখোমুখি অবস্থানে আছে সৌদি আরব ও ইরান। ইয়েমেন, ইরাক সব জায়গাতেই এই দুই দেশের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ছাপ ছিল স্পষ্ট। ইয়েমেনের সরকারকে সমর্থন করছে সৌদি আরব। আর হুতি বিদ্রোহীদের সর্বতভাবে সহায়তা করছে ইরান। ইরাকেও রাজনৈতিক অস্থিরতার পেছনে এই দুই দেশের প্রবল ভূমিকা রয়েছে।

সৌদি-ইরানের বৈরিতা দূর করে সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের লক্ষ্যে চীনের মধ্যস্থতায় গত ১০ মার্চ (২০২৩) তেহরান-রিয়াদের মধ্যে ঐতিহাসিক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। সাত বছর পর ইরান ও সৌদি আরব আবারও কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ঘোষণা দিয়েছে। আশা করা যায় মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নয়নে এই পদক্ষেপ ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

সিরিয়া সংকট

সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধের সূচনা

গণতন্ত্র-মুক্তি-সমৃদ্ধির আশায় ২০১০ সালের ডিসেম্বরের শেষ ভাগে তিউনিসিয়ায় আরব বসন্তের সূচনা হয়। তারপর তা সংক্রমিত হয় লিবিয়া, মিশর, ইয়েমেন, সিরিয়াসহ আরব বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। ২০১১ সালের জানুয়ারির শেষ দিকে সিরিয়ায় বাশার সরকারের বিরুদ্ধে প্রথম বিক্ষোভ দেখা দেয়। তবে তা ছিল ছোট, বিচ্ছিন্ন। সিরিয়াজুড়ে বড় ধরনের বিক্ষোভ দেখা যায় ২০১১ সালের ১৫ মার্চ। এই দিনটিকেই সিরিয়ায় গণ-আন্দোলনের শুরুর দিন হিসেবে গণ্য করা হয়। তবে আরব বসন্ত শুরুর আগে থেকেই দেশটিতে উচ্চ বেকারত্ব, দুর্নীতি এবং রাজনৈতিক অধিকার না থাকা নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছিল বাশার আল আসাদের বিরুদ্ধে।

২০১১ সালে আরব বসন্তে উজ্জীবিত হয়ে প্রথম বিক্ষোভ শুরু হয় সিরিয়ার দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর দিরায়। প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদ তাঁর গদি টিকিয়ে রাখতে বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে শুরু থেকেই কঠোর ব্যবস্থা নিতে থাকেন। অবস্থা বেগতিক দেখে একপর্যায়ে তিনি তাঁর সশস্ত্র বাহিনীকে বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেন। কথিত আছে, যেসব সৈন্য সাধারণ মানুষদের উপর গুলি চালাতে রাজি হয়নি, তাদেরকেও নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। সিরিয়ায় আরব বসন্তের বিক্ষোভ রক্তক্ষয়ী সংঘাতে রূপ নেয়, সংঘাত থেকে শুরু হয় গৃহযুদ্ধ। দেশি-বিদেশি নানা পক্ষের রণক্ষেত্রে পরিণত হয়ে এই যুদ্ধ তারপর অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করে।

সিরিয়া সংকট

সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধের কারণ

জাতিগত দ্বন্দ্ব

গৃহযুদ্ধ শুরু হবার আগেই সিরিয়াতে জাতিদ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করে। সিরিয়াতে মুসলিমদের মাঝে সুন্নি জনসংখ্যা হলো প্রায় ৭৪%, যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং শিয়াপন্থি আলাওয়সি গোষ্ঠী হলো মাত্র ২৬%। কিন্তু আলাওয়সি গোষ্ঠীর ক্ষমতাসীন বাথ পার্টির নেতৃবৃন্দ এককভাবে সকল ধরনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা ভোগ করছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও সুন্নি জনগণ সরকারি মন্ত্রীত্ব ও অন্যান্য রাজনৈতিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল। সুন্নিরা এভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হারানোয় এবং আসাদের Anti-Sunni Policy এর কারণে বঞ্চনার শিকার হওয়ায় তাদের ও শিয়াদের মাঝে জাতিগত দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়, যা গৃহযুদ্ধকে উস্কে দেয়।

অগণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা

সিরিয়ার জনগণ দীর্ঘদিন ধরে গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছে। বাথ পার্টির সরকার জনগণের বাকস্বাধীনতা হরণ করে রেখেছিল। সরকারের সাথে তাদের পার্থক্যটা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ১৯৬৩ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত সিরিয়ান সরকার তার ক্ষমতাবলে জরুরি অবস্থা জারি করে রেখেছিল। আসাদ শাসনামলে সমগ্র সিরিয়ায় অর্থনৈতিক সমস্যার পাশাপাশি দুর্নীতি, অনুন্নত অবকাঠামো এবং নিজ গোষ্ঠীকে অধিক প্রাধান্য দেওয়ার কারণে ছোট ছোট বিদ্রোহ ২০১১ সালের জানুয়ারি থেকেই শুরু হয়েছিল।

সিরিয়া সংকট

➢ জীবনযাত্রার মানের অবনতি

সিরিয়ায় দীর্ঘকাল অগণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা থাকায় সরকার দেশের বা জনগণের কল্যাণে কিছুই করেনি। বরং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী এবং কৃষির ওপর ভর্তুকি প্রত্যাহারের ফলে জীবনযাত্রার ব্যয় ব্যাপক আকার ধারণ করে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ২০০৬ থেকে ২০১১ পর্যন্ত সমগ্র সিরিয়া জুড়ে প্রচণ্ড খরা চলে। ফলে কৃষি কাজ এবং ফসলের উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। ২০০৬ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত প্রায় ৩১ থেকে ৬৩% পর্যন্ত গ্রামের লোকজন পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে শহরে চলে আসে। এই সকল মানুষ পরবর্তীতে সরকার বিরোধী বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করে।

➢ ক্রমবৃদ্ধিমান বেকারত্ব

পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশে যেখানে বেকারত্বের হার ছিল ২.৫%, সেখানে সিরিয়ায় বেকারত্বের হার ছিল ২৫-৩০%, বছরে প্রতি ১০০ জন বেকারের মধ্যে মাত্র ২৫ জনের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হতো। এভাবে বেকারত্বের হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে তরুণদের হতাশা ক্ষোভে পরিণত হয়। তার উপর আসাদের নব্যউদারতাবাদ অর্থনৈতিক সংস্কার নীতি শিল্প খাতে বিনিয়োগ আরো কমিয়ে দেয়। রপ্তানি থেকে আমদানি নির্ভর অর্থনীতি হওয়াতেও সিরিয়ার জনগণ বেকারত্বে ভুগতে শুরু করে। এসকল কারণে আসাদ সরকারের বিরুদ্ধে জন-অসন্তোষ বাড়তে থাকে।

সিরিয়া সংকট

বিদেশি শক্তিদের স্বার্থ

সিরিয়া সংকটের পেছনে বৈদেশিক স্বার্থান্বেষী মহলের উস্কানিও কাজ করেছে। মধ্যপ্রাচ্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সিরিয়ার কৌশলগত অবস্থান পৃথিবীর ক্ষমতাশালী রাষ্ট্রগুলোর জন্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘকাল ধরে আসাদ সরকারের অনেকটা চীন, ইরান, রাশিয়া ঘেষা নীতি যুক্তরাষ্ট্রের জন্যে ক্রমাগত দুশ্চিন্তার কারণ ছিল। তাছাড়া ফিলিস্তিনের হামাস ও লেবাননের হিজবুল্লাহ গ্রুপের কাছে অস্ত্র পাঠানোর জন্যে সিরিয়া ইরানের একমাত্র রুট হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। সুতরাং সিরিয়ার আসাদ সরকার যুক্তরাষ্ট্র ও তার ঘনিষ্ঠ মিত্র ইসরায়েলের জন্যেও ছিল অনেকটা হুমকি স্বরূপ। তাই যুক্তরাষ্ট্র আসাদ সরকার বিরোধী আন্দোলনকারীদের আর্থিকভাবে এবং সামরিকভাবে সহযোগিতা প্রদান করেছে। উইকিলিকস কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য মতে, যুক্তরাষ্ট্র সিরিয়ার আন্দোলনকারীদের মিলিয়ন ডলার সাহায্য দিয়েছে। পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধুপ্রতিম আরব দেশগুলো সিরিয়ার সরকার বিরোধী আন্দোলনকারীদেরকে সাহায্য ও সহযোগিতা করছে। যেমন সৌদি আরব, আরব আমিরাত, কাতার ইত্যাদি। বিশেষত কাতার সিরিয়ার উপর দিয়ে গ্যাস লাইন ইউরোপ পর্যন্ত নিতে চায়। তাতে রাশিয়ার স্বার্থের ক্ষতি হবে বলে আসাদ সরকার কখনই তা হতে দিবেনা। তাই কাতার বিরোধী দলের পিছনে বিপুল অর্থ ঢেলেছে বাশার সরকারের পতনের জন্য।

সিরিয়া সংকট

সিরিয়া সংকটের সম্ভাব্য সমাধান

সিরিয়া সংকট এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে যেখানে ইরান, সৌদি আরব, তুরস্ক, রাশিয়া, আমেরিকা সবারই বৃহৎ স্বার্থ জড়িত এবং কেউই তাদের স্বার্থ পরিত্যাগ করতে চায়না। এমন পরিস্থিতিতে সমাধান তখনই সম্ভব যখন সব পক্ষ তাদের স্বার্থ ত্যাগ করে নিষ্পাপ নিরীহ সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করবে। এজন্য জাতিসংঘকে কাগুজে বাঘ হয়ে না থেকে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে হবে। সিরিয়া সমস্যা সমাধানে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে-

✓ জাতিসংঘের শান্তি প্রস্তাব গ্রহণ করে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।
✓ যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ করতে হবে।
✓ মধ্যপ্রাচ্যে ধর্মীয় মতপার্থক্য কমিয়ে আনতে হবে।
✓ বিভিন্ন বিদ্রোহী গ্রুপগুলোকে শান্তি প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
✓ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জাতীয় সরকার গঠন করে স্থিতিশীলতা নিয়ে আসতে হবে।

পরিশেষে, সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ থামার কোনো লক্ষণ এখন পর্যন্ত নেই। দেশটির প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদ আগেই স্পষ্ট করেছেন যে তিনি তার ক্ষমতার প্রশ্নে কোনো ছাড় দিতে রাজি নন। বরং তিনি ২০১১ সালের মার্চের আগের অবস্থায় ফিরতে চান। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সিরিয়ায় শান্তি ফেরানোর ব্যাপারে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। সিরিয়ায় হত্যাযজ্ঞ-ধ্বংসযজ্ঞ বন্ধে তাদের পক্ষ থেকে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেই। উপরন্তু, জাতিসংঘের নেতৃত্বাধীন একটি আলোচনা ২০২১ সালের জানুয়ারিতে জেনেভায় ভেস্তে যায়। সিরিয়ায় চলমান গৃহযুদ্ধ-অচলাবস্থার ব্যাপারে পশ্চিমা নির্ধারক শক্তিগুলো আগ্রহ হারিয়েছে বলে মনে করছেন আন্তর্জাতিক বিষয়ের বিশ্লেষক সাইমন টিসডিল। এই যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি দেখে একে একটি 'সীমাহীন যুদ্ধ' (endless war) বলে অভিহিত করেছেন 'Win Without War' সংগঠনের অ্যাডভোকেসি ডিরেক্টর স্টিফেন মাইলস।

ইয়েমেন সংকট

ইয়েমেনে গৃহযুদ্ধের কারণ

শিয়া-সুন্নি বিরোধ : ইয়েমেনের জনসংখ্যার প্রায় পুরোটাই মুসলিম এবং এদের ৬৫ ভাগ সুন্নি যারা দক্ষিণাঞ্চলে বসবাস করে ও বাকি ৩৫ ভাগ শিয়া যারা বাস করে উত্তরাঞ্চলে। ১৯৯০ সালে দুই ইয়েমেন একীভূত হলেও কার্যত উত্তর ও দক্ষিণ ইয়েমেনের মাঝে প্রবল বিভাজন উপস্থিত ছিল। সুন্নিপন্থি একনায়ক আব্দুল্লাহ সালেহ ক্ষমতায় দীর্ঘকাল আসীন থাকায় তার বিরুদ্ধে শিয়া বিচ্ছিন্নতাবাদীরা অনেক আগে থেকেই বিদ্রোহ করে আসছিল। ২০১১ সালের পর থেকে তা প্রকট হয়ে ওঠে। এই সুন্নি-শিয়া বিরোধ গোটা মধ্যপ্রাচ্যের জন্যই অস্থিতিশীলতার কারণ হয়ে উঠেছে। সরকারি বাহিনীর পক্ষে সুন্নি সৌদি ও হুতি বিদ্রোহীদের পক্ষে শিয়া ইরান অবস্থান নিয়ে ইয়েমেনের মাটিতে মূলত একটি Proxy War বা ছায়াযুদ্ধই সংঘটিত হচ্ছে সৌদি ও ইরানের মাঝে।

ইয়েমেন সংকট

➢ দীর্ঘ স্বৈরাচারী শাসন

১৯৯০ সালে দুই ইয়েমেন এক হবার পর থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত আলী আব্দুল্লাহ সালেহ ইয়েমেনের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতায় ছিলেন। এর মাঝে ১৯৯৯ ও ২০০৬ সালে দুইবার প্রহসনের নির্বাচনে সালেহ বিপুল ভোটে নির্বাচিত হন। এছাড়াও তিনি ২০০১ সালে এক চরম বিতর্কিত সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে নিজের ক্ষমতা আরো দীর্ঘায়িত ও কুক্ষিগত করেন। তেলসম্পদে সমৃদ্ধ হলেও বাকি আরব দেশগুলোর নাগরিকদের মতো ইয়েমেনের নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হচ্ছিল না। চরম দুর্নীতির কারণে ইয়েমেনের জনগণ দরিদ্রতা, বেকারত্ব ও শোষণের শিকার হচ্ছিল। তার আমলে খাদ্য সংকটের কারণে ১৯৯২ সালের দাঙ্গা, জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে ২০০৫ সালের বিক্ষোভ ও হতাহত হবার ঘটনা ছাড়াও ২০০০, ২০০৭ ও ২০০৮ সালের আত্মঘাতি বোমা হামলার মতো একের পর এক সহিংসতার ঘটনা ঘটছিল। এর মধ্যে ২০০৪ সালে শিয়াপন্থি হুতি বিদ্রোহীরা আনুষ্ঠানিকভাবে ইয়েমেন সরকারের বিরুদ্ধে বিপ্লবের ঘোষণা দেয়, ইয়ামেনে আসন্ন গৃহযুদ্ধের আভাস তখন থেকেই পাওয়া যাচ্ছিল।

ইয়েমেন সংকট

➢ হুতি বিদ্রোহীদের উত্থান

উত্তর ইয়েমেনের শিয়া আলেম হুসেইন বদরউদ্দিন আল হুতির নাম অনুসারে হুতি বিদ্রোহী বাহিনীর নামকরণ করা হয়েছে। ২০০৪ সালে তারা ইয়েমেনের ক্ষমতাসীন সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঘোষণা দেয়। হুতিদের বিরুদ্ধে ইয়েমেন সরকার শরিয়া আইন বাস্তবায়ন করতে চাওয়ার অভিযোগ তুললেও হুতিরা পালটা দাবী করে, জনগণের সাথে সরকারের করা বৈষম্যের বিরুদ্ধে তাদের এই আন্দোলন। যোদ্ধাদের কাছে আগেই ব্যক্তিগত পর্যায়ে গোলাবারুদ মজুদ ছিল। পরবর্তীতে ইরান থেকে তাদের অস্ত্র, ব্যালিস্টিক মিসাইল ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়।

➢ সৌদি আরব ও ইরানের সংশ্লিষ্টতা

লোহিত সাগরের বাব এল মান্দেব প্রণালির মুখে অবস্থিত ইয়েমেন সৌদি আরবের জন্য বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। ১৯৩২ সাল থেকেই ইয়েমেনের ওপর প্রভাব বিস্তারে সক্রিয় ছিল সৌদি আরব। ১৯৩৪ সালে এই দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ হয়। কয়েকটি চুক্তির মাধ্যমে এই যুদ্ধের অবসান হলেও সৌদি আরব নানা উপায়ে ইয়েমেনের ভেতরে বিশৃঙ্খলা ও রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে গেছে। সীমান্ত বিরোধ নিয়ে কখনো কখনো সামরিক অভিযানও পরিচালনা করেছে। ২০১৫ সালে হুতি বিদ্রোহীরা রাজধানী সানা দখল করে নিলে সৌদি আরব সমমনা অন্যান্য আরব ও মুসলিম দেশগুলোর সাথে জোট বেঁধে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শুরু করে। ইরান শিয়া হুতিদের সহায়তা করছে, এই অভিযোগ করে সৌদি আরব ইয়েমেনের ওপর অবরোধ জারি করেছে। এই অবরোধ আরোপ ইয়েমেনে মানবিক সংকটের অন্যতম কারণ। ইরানও এ অঞ্চলে তাদের প্রভাব বৃদ্ধি করতে হুতি বিদ্রোহীদের সহায়তা করছে যদিও তারা এই অভিযোগ অস্বীকার করে।

ইয়েমেন সংকট

➢ পশ্চিমা দেশগুলোর তেলস্বার্থ

দরিদ্র দেশ ইয়েমেনের গৃহযুদ্ধে বিশ্বের পরাশক্তিগুলোর আকৃষ্ট হওয়ার মূল কারণ এডেন উপসাগর। লোহিত সাগর ও এডেন উপসাগরের মাঝখানে ইয়েমেনের অবস্থান। এই নৌপথ দিয়েই বিশ্বের অধিকাংশ তেলবাহী জাহাজ চলাচল করে। ইয়েমেন যার নিয়ন্ত্রণে থাকবে, তার পক্ষে তেল সম্পদের ওপর খবরদারি করাও সহজ হবে। আর এই অংশটি নিরাপত্তা ঝুঁকিতে পড়লে তেল পরিবহনও হুমকির মুখে পড়বে। তাই ইরান সমর্থিত হুতি বিদ্রোহীরা যাতে ইয়েমেনের ক্ষমতায় না যেতে পারে তাই সৌদি সামরিক জোটকে পশ্চিমা বিশ্ব অর্থ, অস্ত্র ও অন্যান্য সহায়তা দান করছে। ফলে যুদ্ধ আরও দীর্ঘায়িত হচ্ছে।

কুর্দিস্তান সংকট

স্বাধীন কুর্দিস্তান আন্দোলন

ওসমানীয় খেলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে স্বাধীন কুর্দিস্তানের জন্য সর্বপ্রথম আন্দোলন শুরু হয়। ১৮৮০ সালে শেখ ওবায়দুল্লাহ নামক এক প্রভাবশালী কুর্দি নেতা প্রথম স্বায়ত্তশাসন বা স্বাধীনতার দাবী তোলেন যেখানে কুর্দিস্তানের উপর ইরান বা তুরস্কের কোন প্রভাব থাকবে না। কিন্তু সেই বিদ্রোহ দমন করে ওবায়দুল্লাহকে ইস্তানবুল নির্বাসনে পাঠানো হয়। এরপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ওসমানী সাম্রাজ্যের পতন ঘটলে ১৯১৯-২০ সালে প্যারিসে স্বাক্ষরিত 'সেভার্স চুক্তি'তে একটি স্বাধীন কুর্দিস্তানের কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু ১৯২৩ সালে স্বাক্ষরিত 'লুজান চুক্তি' নামক নতুন একটি চুক্তিতে কুর্দিস্তানের কথা উল্লেখ ছিল না। বরং কুর্দিস্তান তখন ইরান, তুরস্ক, ইরাক ও সিরিয়ার মাঝে বিভক্ত হয়ে যায়।

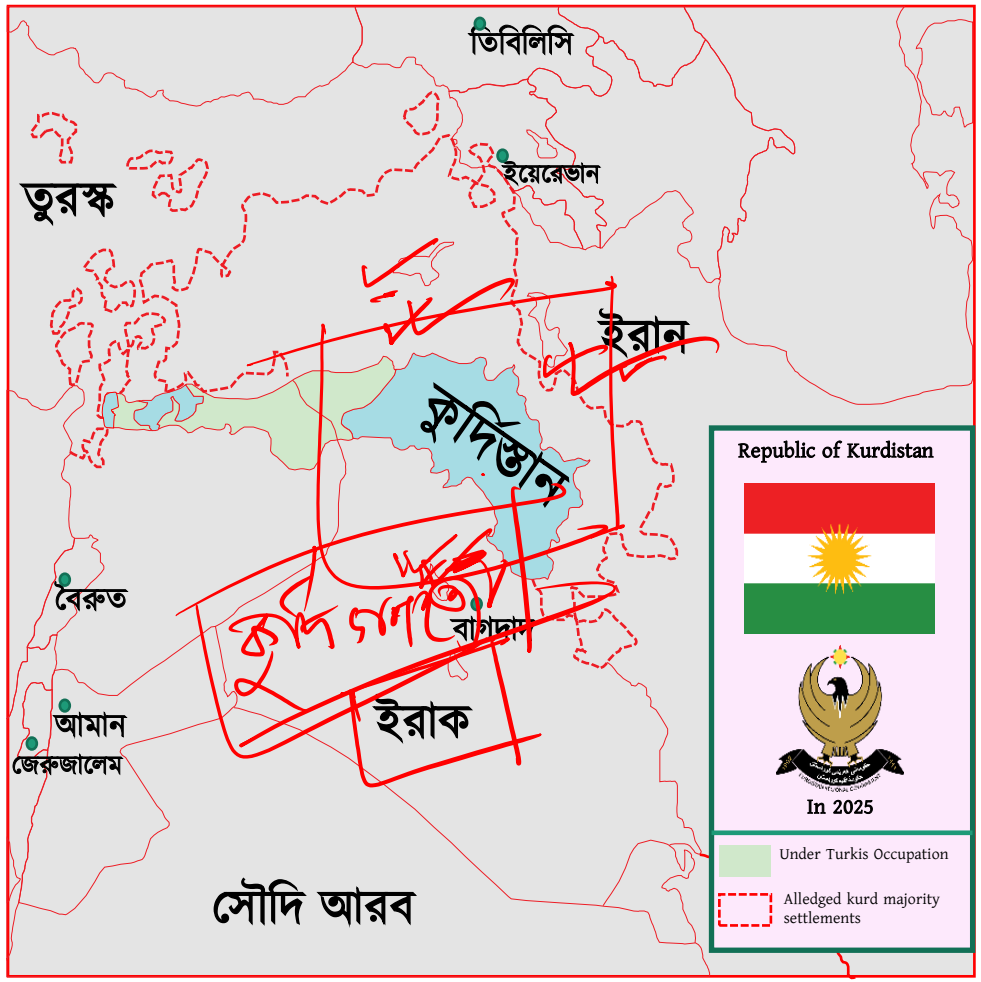

কুর্দিস্তান সংকট

কুর্দিদের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল

কুর্দিদের রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী এই দুইটি প্রধান ধারায় বিভক্ত। Kurdistan Democratic Party (KDP) এবং Patriotic Union of Kurdistan (PUK) হলো কুর্দিদের জাতীয়তাবাদী ঘরনার রাজনৈতিক দল। অপরদিকে তুরস্কে রয়েছে Kurdistan Workers Party (PKK) যারা মূলত মার্ক্সবাদী সমাজতান্ত্রিক মুল্যবোধ নিয়ে একটি স্বাধীন কুর্দিস্তানের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। ১৯৭৯ সাল থেকে KDP এর নেতা ইরাকি কুর্দিস্তানের প্রেসিডেন্ট মাসউদ বারজানি। তিনি তার বাবা মুস্তফা বারজানি থেকে KDP এর নেতৃত্ব পেয়েছেন। অপরদিকে PUK এর প্রধানের নাম জালাল তালেবানি। '৯০ দশকে মাসউদ বারজানি ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের সহায়তায় ইরানি সহায়তাপুষ্ট PUK কে পরাজিত করে ইরাকি কুর্দিস্তান থেকে বের করে দেন। ১৯৯৮ সালের গৃহযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্র কুর্দি এলাকাকে বিভক্ত করে উত্তরে মাসউদ বারজানিকে ও উত্তর পশ্চিমে জালাল তালেবানিকে কর্তৃত্ব দেয়।

মিয়ানমারে সেনা অভ্যুত্থান

❖ মিয়ানমারে সামরিক বাহিনীর অতিরিক্ত প্রভাব থাকার কারণ

- মিয়ানমারে সেনা শাসন অনেক পুরানো এবং দীর্ঘস্থায়ী। এশিয়ার অন্যান্য দেশের মতো এটিও ব্রিটিশ শাসনাধীন ছিল। ব্রিটিশ শাসনামলে বার্মায় শক্তিশালী সেনাবাহিনী ছিল। দেশটির সেনাবাহিনী স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব দেয়। বার্মার স্বাধীনতার নেতৃত্ব দেন জেনারেল অং সান এবং তাকে দেশটির সামরিক বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই বার্মার জনগণ সেনাবাহিনীকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতো এবং ভাবতো তারাই দেশের রক্ষাকারী।
- স্বাধীনতা লাভের পর জাতিগত সংঘাত, বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন, দুর্নীতি এবং অব্যবস্থাপনায় জর্জরিত হয়ে পড়ে দেশটি। এ সুযোগে সামরিক বাহিনী ক্ষমতায় আসে। সেনাবাহিনী সবসময় ভাবতো যে মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ সম্পদ দিয়ে নিজ দেশের সমস্যার সমাধান করা যাবে। ফলে আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি নিয়ে সামরিক জান্তারা খুব একটা মাথা ঘামায়নি।
- স্বাধীনতা লাভের পর দেশের ভিতরে জাতিগত সংঘাত মোকাবিলার জন্য বার্মার সেনাবাহিনীর শক্তি বাড়ানো হয়। ফলে একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী ধীরে ধীরে রাজনীতিতে নিয়ন্ত্রণ দৃঢ় করতে শুরু করে ।
- ২০১৫ সালে পাঁচ বছরের জন্য অং সান সুচির 'ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসি' একটি বেসামরিক সরকার গঠন করলেও সেনাবাহিনীর প্রভাব থেকে বা রাষ্ট্রীয় কাঠামো থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। একটি দেশে বেসামরিক সরকার যখন কার্যকরভাবে দেশ পরিচালনায় ব্যর্থ হয়, তখন সেখানে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ ঘটে। মিয়ানমারের ক্ষেত্রেও এটি ঘটেছে।

মিয়ানমারে সেনা অভ্যুত্থান

- আন্তর্জাতিক সমর্থন সেনাবাহিনীর টিকে থাকার অন্যতম কারণ। ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপের ২০০১ সালের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বার্মার সঙ্গে জাপান ও ভারতের সম্পর্ক বরাবরই ভালো ছিল। আর চীন ১৯৮৮ সালে মিয়ানমারের সামরিক সরকারকে স্বীকৃতি দেয়। রাজনৈতিক এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি দেশটির অর্থনৈতিক খাতেও সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। তাছাড়া মিয়ানমারের আসিয়ান জোটে যোগদানের ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সাথে ভালো সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মিয়ানমারে সামরিক শাসন নিয়ে এসব দেশ কখনোই তেমন উচ্চবাচ্য করেনি।
- ২০০৮ সালে মিয়ানমারের সংবিধানে দেশটির সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী রাজনৈতিক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। মিয়ানমারের সংসদে এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ ২৫ শতাংশ আসন বরাদ্দ রাখা হয়। তবে শুধু আসন সংরক্ষিত রাখাই নয়, সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও সেনাবাহিনীর হাতে রয়েছে। এ তিনটি বিষয় হচ্ছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সীমান্ত সংক্রান্ত বিষয়। তাছাড়া ভাইস প্রেসিডেন্ট সেনাবাহিনী দ্বারা মনোনীত হবেন। বর্তমানে মিয়ানমারে যে সংবিধান রয়েছে, তাতে বেসামরিক সরকারের উপর সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত হয়েছে। তাই যেকোনো পরিবর্তনের জন্য সামরিক আইন প্রণেতার সমর্থন প্রয়োজন। মিয়ানমারের সংবিধান অনুযায়ী যদি ইউনিয়নের বিভেদ ঘটে, জাতীয় সংহতির বিভেদ ঘটে ও সার্বভৌম ক্ষমতা কমে আসে, এমন পরিস্থিতিতে দেশটির সেনাপ্রধান ক্ষমতা নিতে পারবেন। তবে শুধুমাত্র জরুরি অবস্থা চলাকালীন তিনি ক্ষমতা নিতে পারবেন এবং সেই জরুরি অবস্থা শুধুমাত্র বেসামরিক প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করতে পারবেন।

২০২১ সালের মিয়ানমারে সেনা অভ্যুত্থান

মিয়ানমারে সেনা অভ্যুত্থানের পেছনে প্রধান কারণ

- সেনাপ্রধান মিন অং হ্লাইংয়ের চাকরির মেয়াদ ছিল ২০২১ সালের জুন মাস পর্যন্ত। তার পরিকল্পনা ছিল, সেনাবাহিনী থেকে অবসরে গিয়ে সে মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী সমর্থিত রাজনৈতিক দল ইউনিয়ন সলিডারিটি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টিতে (ইউএসডিপি) যোগ দেবে এবং নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় কোনও একসময় ক্ষমতায় আসীন হবে। কিন্তু ইউএসডিপি নির্বাচনে হেরে যাওয়ায় সেনাপ্রধান মিন অং হ্লাইং নিজের কোনও রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ না দেখে তাকে মিয়ানমারের প্রেসিডেন্ট করার জন্য সুচি-কে একটি প্রস্তাব দেয়। কিন্তু সুচি এ প্রস্তাবে রাজি হয়নি। ফলে, নিজের রাজনৈতিক ক্যারিয়ার নিশ্চিত করার জন্য তার পক্ষে সামরিক অভ্যুত্থান ছাড়া আর কোনও বিকল্প ছিল না। কারণ, ২০২১ সালের জুনের পরে মিন অং হ্লাইং একজন সাধারণ নাগরিকে পরিণত হতেন।

২০২১ সালের মিয়ানমারে সেনা অভ্যুত্থান

- আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার আদালতে রোহিঙ্গাদের ওপর জেনোসাইড সংঘটনের যে বিচার হচ্ছে, সেখানে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে জেনোসাইডের যে অভিযোগ আনা হয়েছে সেটা যদি প্রমাণিত হয় তাহলে এই জেনোসাইডের মূল কমান্ডিং রেসপন্সিবিলিটি নিতে হবে বর্তমান জেনারেল মিন অং হ্লাইংকে। এছাড়াও বাইডেন প্রশাসনও মিয়ানমারের বিরুদ্ধে যে জেনোসাইডের অভিযোগ এনেছে সেটা যাচাই-বাছাই করার জন্য একটি রিভিউ কমিশন করা হয়েছে, সেখানেও যদি কোনও ধরনের জেনোসাইডের প্রমাণ পাওয়া যায় তার জন্যও প্রধানত দায়ী হবে জেনারেল মিন অং হ্লাইং।

  এছাড়া আর্জেন্টিনার আদালতে এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতেও জেনোসাইডের অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। সুতরাং ২০১৭ সালে রাখাইনে যে জেনোসাইড হয়েছে তার সব দায়দায়িত্ব সুচির সরকারের ঘাড়ে না গিয়ে সেনাবাহিনীর কমান্ডার-ইন-চিফ হিসাবে মিন অং হ্লাইং-এর ঘাড়ে গিয়ে পড়বে। বাকি জীবন তাকে একটা জেনোসাইড সংঘটনকারী জেনারেলের কলঙ্ক নিয়ে কাটাতে হবে। তাই, সামরিক অভ্যুত্থান করে নিজেকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করে এসবের মোকাবিলা করা ছাড়া তার অন্য কোনও উপায় ছিল না।

২০২১ সালের মিয়ানমারে সেনা অভ্যুত্থান

- ২০০৮ সালে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে মিয়ানমারের ক্ষমতা কাঠামো এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় সেনাবাহিনীর অবস্থানকে একটা শক্ত ভিত্তি দেওয়া হয়। যেমন: সংসদের ২৫ শতাংশ আসন সেনাবাহিনীর জন্য বরাদ্দ থাকবে; স্বরাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা এবং সীমান্ত মন্ত্রণালয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ তিনটি মন্ত্রণালয় সেনাবাহিনীর জন্য বরাদ্দ থাকবে; রাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট হবে সেনাবাহিনী থেকে এবং দেশের কামান্ডার-ইন-চিফ থাকবে পদাধিকার বলে মিয়ানমারের সেনাপ্রধান প্রভৃতি। এরকম একটি শক্ত ভিত্তির ওপর সেনাবাহিনীকে দাঁড় করানোর পরও ক্রমান্বয়ে দেশের কাছে, দেশের মানুষের কাছে এবং বিদেশের কাছে সেনাবাহিনীর জনপ্রিয়তা, প্রভাব বলয় এবং ক্ষমতা ক্রমান্বয়ে খর্ব হতে শুরু করে, ফলে সুচি'র জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সাথে সাথে তার ক্ষমতা, প্রতিপত্তি এবং আধিপত্যও ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। ২০২০ সালের নির্বাচনের ফলাফলও সেনাবাহিনীকে মিয়ানমারের জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যানের এক ধরনের ইঙ্গিত বহন করে। সুতরাং সেনাবাহিনীর ক্ষমতা, প্রতিপত্তি, গৌরব এবং আধিপত্য পুনরুদ্ধারের জন্য সেনা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা গ্রহণ করা ছাড়া সেনাবাহিনীর অন্য কোনও উপায় ছিল না।

২০২১ সালের মিয়ানমারে সেনা অভ্যুত্থান

- ২০১৫ সালে গণতন্ত্রের পথে প্রথম বহুদলীয় নির্বাচন হলে মিয়ানমার গণতন্ত্রায়নের দিকে যাত্রা শুরু করার মর্মে এক ধরনের উপস্থাপনা বিশ্বমিডিয়ায় ব্যাপক প্রচার পায়। ২০২০ সালের নির্বাচনে সুচির দল মেজরিটি পেলে মিয়ানমার সত্যিকার গণতন্ত্রের দিকে ধাবিত হতে পারে, এরকম একটি সম্ভাবনা তৈরি হয়। আর মিয়ানমারে যদি সত্যিকার গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরি হয়, তাহলে বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে, বৈদেশিক বিনিয়োগ বাড়বে এবং আন্তর্জাতিক সাহায্য-সহযোগিতার বৃদ্ধি ঘটবে। পাশাপাশি লিবারেল ডেমোক্র্যাসির সুযোগ নিয়ে ইউরোপ আমেরিকাসহ পশ্চিমা দেশগুলো মিয়ানমারের বিভিন্ন ধরনের ডেমোক্র্যাটিক ইনস্টিটিউশনকে প্রমোট করবে, যা সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব, ক্ষমতা এবং আধিপত্যকে ক্রমান্বয়ে খাটো করে দেবে। তাছাড়া, ডেমোক্র্যাটিক ইনস্টিটিউশনগুলো যদি যথাযথভাবে কাজ করতে শুরু করে তাহলে সেনাবাহিনীর যে বহুবিধ বাণিজ্যিক কার্যক্রম এবং লাভজনক প্রকল্প রয়েছে, সেসব ক্রমান্বয়ে বন্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং নভেম্বরের নির্বাচনের ফলাফল থেকে ‘পর্দার আড়ালে বসে দেশের গুটি চালানোর চেয়ে পর্দার সামনে এসে গুটি চালানো উত্তম’ এরকম একটা দর্শন সেনাবাহিনীর মধ্যে কাজ করতে শুরু করে। ফলে, সামরিক অভ্যুত্থান অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

আজারবাইজান ও আর্মেনিয়া সংকট

কৃষ্ণসাগর আর কাস্পিয়ান সাগরের মধ্যবর্তী আজারবাইজান,আর্মেনিয়া ও জর্জিয়া অধ্যুষিত এই ককেশাস অঞ্চল। আধুনিক যুগের শুরুতে রুশ সাম্রাজ্য এবং অটোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে অব্যাহত যুদ্ধের কারণ হয়েছে এই অঞ্চল। সর্বশেষ ২০২০ সালের ২২ সেপ্টেম্বর সেখানে আর্মেনিয়া-আজারবাইজান যুদ্ধ শুরু হয়। সমাপ্তি ঘটে ১০ নভেম্বর একটি শান্তিচুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে। এ অঞ্চলের দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি- রাশিয়া ও তুরস্কের হস্তক্ষেপে স্বাক্ষরিত হয় এই চুক্তি। বিরোধীয় অঞ্চল নাগার্নো-কারাবাখ তথা আর্মেনিয়া-আজারবাইজানের যুদ্ধটি সাম্প্রতিক কালের হলেও বিরোধের উৎস অতীতেই নিহিত রয়েছে।

❖ দ্বন্দ্বের ইতিহাস

নাগার্নো-কারাবাখ হচ্ছে দক্ষিণ ককেশাসের একটি স্থলবেষ্টিত ভূ-ভাগ। এটি আজারবাইজান ও আর্মেনিয়ার মূল বিরোধপূর্ণ ভূ-খন্ড। ইতিহাস পরম্পরার অনেক পঙ্কিল পথ অতিক্রম করে এটি আজারবাইজানের অংশ হিসেবে বিশ্বসমাজের স্বীকৃতি পেয়েছে। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত ২০০৮ সালের একটি প্রস্তাবে এই স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ঐ প্রস্তাবে নাগার্নো-কারাবাখ থেকে আর্মেনীয় সেনা প্রত্যাহারের আহ্বান জানানো হয়। উল্লেখ্য যে, এটি রাজনৈতিকভাবে আজারবাইজানের স্বীকৃত অংশ হলেও এখানের অধিকাংশ জনগণ খ্রিস্টধর্মাবলম্বী। এখানের প্রায় ১৫ শতাংশ মুসলিম জনসংখ্যা। খ্রিষ্টধর্মীয়রা আনুগত্য পোষণ করে আর্মেনিয়ার প্রতি। অপরদিকে সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীর মমত্ব আজারবাইজানের প্রতি।

আজারবাইজান ও আর্মেনিয়া সংকট

প্রত্নতাত্ত্বিকরা বলেন, আর্মেনিয়রা খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল। সপ্তম শতকের মাঝামাঝি সময়ে মুসলমানগণ কর্তৃক পারস্য বিজয়ের সুবাদে এই অঞ্চলটি আরব-মুসলিমদের হাতে আসে। পরবর্তীকালে এটি খেলাফত কর্তৃক অনুমোদিত স্থানীয় গভর্নরদের দ্বারা শাসিত হতো।

- দীর্ঘকাল এটি আর্টসাখ নামে কার্যত একটি স্বাধীন আধিপত্য হিসেবে বিদ্যমান ছিল।
- পঞ্চদশ শতাব্দীতে এটি তুর্কি শাসনের অধীন হয়।
- সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এখানে রুশ সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এই অঞ্চলটি পারস্য সম্রাট নাদির শাহের করায়ত্ত হয়। ১৫০১-১৭৩৬ সাল পর্যন্ত কারাবাখ প্রদেশটি সাফাভিদ সাম্রাজ্যের অধীন থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কারাবাখ এই অঞ্চলে রুশ প্রভুত্ব স্বীকৃত হয়।
- ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের সময় কারাবাখ ট্রান্সককেশীয় গণতান্ত্রিক ফেডারেটিভ রিপাবলিকের অংশে পরিণত হয়। স্ট্যালিনের সময় সিদ্ধান্তহীনতার কারণে নাগার্নো কারাবাখ আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজানের বিরোধীয় অঞ্চলে পরিণত হয়।
- ১৯১৮ সালে কারাবাখের জনগণ নিজেদেরকে স্বশাসিত ঘোষণা করে। তুর্কি সুলতান আজারবাইজানের সমর্থনে নাগার্নো কারাবাখদের স্বাধীনতার দাবি অগ্রাহ্য করে তা দখল করে নেয়।
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধে উসমানীয় সালতানাতের পরাজয়ের পর ব্রিটিশ সেনারা নাগার্নো কারাবাখ দখল করে। বহুপক্ষীয় বিরোধের কারণে ১৯২০ সালের ভার্সাই চুক্তিতে নাগার্নো-কারাবাখ বিষয়টি অমীমাংসিত থেকে যায়। ১৯২০ সালে আজারবাইজান নাগার্নো-কারাবাখ দখল করে নেয়। পরে আর্মেনিয়ার সঙ্গে চুক্তিবলে সেখানে বলশেভিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

আজারবাইজান ও আর্মেনিয়া সংকট

- ১৯২১ সালে বলশেভিকরা আর্মেনিয়া, আজারবাইজান ও জর্জিয়া দখল করে নেয়। তুরস্ককে কৌশলগত প্রশ্রয় দেওয়ার প্রয়োজনে বলশেভিকরা কারাবাখে আজারবাইজানের কর্তৃত্ব পরোক্ষভাবে স্বীকার করে নেয়।
- ১৯৮৮ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি নাগার্নো-কারাবাখের লোকেরা আর্মেনিয়ার সঙ্গে একীভূত হওয়ার লক্ষ্যে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। রুশ কর্তৃপক্ষ তাদের এ দাবি অগ্রাহ্য করে। সেই সময় থেকে নাগার্নো-কারাবাখের আর্মেনীয়পন্থী ও আজারবাইজানিপন্থী গ্রুপগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ প্রবল হয়ে ওঠে।
- ১৯৯১ সালে আর্মেনিয়া ও আজারবাইজান উভয় সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে স্বাধীনতা লাভের পর নাগার্নো-কারাবাখের কর্তৃত্ব নিয়ে লড়াই-যুদ্ধের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন তথা রাশিয়া দৃশ্যত ঐ অঞ্চলকে স্বাধীনতা দিলেও মূল নিয়ন্ত্রণ প্রকারান্তরে তাদের হাতে রাখে। বিস্ময়ের ব্যাপার রাশিয়া আর্মেনিয়া ও আজারবাইজান উভয় দেশকে সামরিক সহায়তা দেয়।
- ১৯৯৪ সালের মে মাসে আজারবাইজান কার্যত আর্মেনিয়ার কাছে পরাজিত হয়। এ সময়ে নাগার্নো-কারাবাখের ১৪ শতাংশ অঞ্চল আর্মেনিয়রা দখল করে নেয়। রাশিয়ার মাধ্যমে ১৯৯৪ সালের ১২ মে সাময়িক যুদ্ধ বিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- যুদ্ধ বিরতি সত্ত্বেও আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানীয় সেনাদের মধ্যে সশস্ত্র দ্বন্দ্ব অব্যাহত থাকে।
- ২০০৫ সালের ২৫ জানুয়ারি ইউরোপীয় পার্লামেন্ট আজারবাইজানীদের বিরুদ্ধে কথিত জাতিগত নির্মূলের নিন্দা করে।
- অন্যদিকে ২০০৭ সালের মে মাসের মধ্যভাগে ইসলামি সম্মেলন সংস্থা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ আজারবাইজানের পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করে। তারা আর্মেনিয়ার আগ্রাসনেরও নিন্দা করে। একই বছরের ১৪ মার্চ জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবে নাগার্নো-কারাবাখের ওপর আজারবাইজানের কর্তৃত্বের স্বীকৃতি দেওয়া হয়।
- সেসব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার ফলে ২০১৬ সালে ২ এপ্রিল উভয় দেশের সেনাবাহিনী আবারও যুদ্ধে লিপ্ত হয়।
- **সম্প্রতি ২০২০ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১০ নভেম্বর পর্যন্ত দুই দেশের মধ্যে সর্বাত্মক যুদ্ধ সংঘটিত হয়।**

আজারবাইজান ও আর্মেনিয়া সংকট

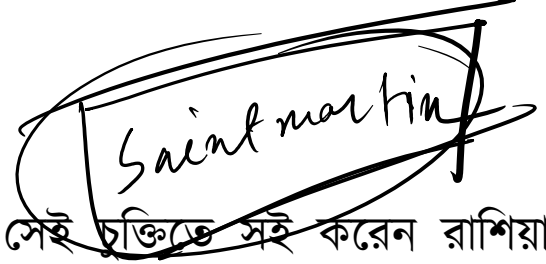

- প্রায় দেড় মাসের যুদ্ধাবশেষে ২০২০ সালের ১০ নভেম্বর একটি যুদ্ধ বিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। সেই চুক্তিতে সই করেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, আজারবাইজানের প্রেসিডেন্ট ইলহাম আলিয়েভ ও আর্মেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী নিকোল পাশিনিয়ান। সংবাদমাধ্যম দ্য নিউজ আরব'র এক প্রতিবেদেন নাগার্নো-কারাবাখ শান্তিচুক্তির মূলশর্তগুলো তুলে ধরা হয়েছে। **শর্তগুলো নিম্নরূপ:**

- **যুদ্ধবিরতি:** চুক্তির মূল শর্তগুলোর প্রথমেই রয়েছে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধবিরতি। বর্তমানে দুই দেশের সেনারা যে ভূমিতে অবস্থান করছেন তারা সেখানেই থাকবেন। এর ফলে, সাম্প্রতিক যুদ্ধে আর্মেনিয়ার কাছ থেকে নিয়ন্ত্রণে নেওয়া শুশা শহরসহ অন্যান্য এলাকায় আজারবাইজান অবস্থান করবে।

- **শান্তিরক্ষী বাহিনী:** বিরোধপূর্ণ অঞ্চলে শান্তিরক্ষী বাহিনী হিসেবে রাশিয়ার ১ হাজার ৯৬০ জন সেনা মোতায়েন করা হবে। তাদের সঙ্গে থাকবে ছোট অস্ত্র, ৯০টি আর্মার্ড পারসোনেল ক্যারিয়ার, ৩৮০ ইউনিট অটোমোবাইল ও বিশেষ যন্ত্র। শান্তিরক্ষীরা দুই দেশের নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর অবস্থান করবেন।

- **ভূমি ফেরত:** আর্মেনিয়া আঘদাম জেলা আজারবাইজানের কাছে ফেরত দেবে। এছাড়াও, আর্মেনিয়ার নিয়ন্ত্রণে থাকা কালবাজার জেলা ও লাচিন জেলা আজারবাইজানের কাছে হস্তান্তর করা হবে। আগে শুশার মধ্য দিয়ে নাগার্নো-কারাবাখের সঙ্গে যোগাযোগ করতো আর্মেনিয়া। এখন তারা পাঁচ কিলোমিটার প্রশস্ত লাচিন করিডোর দিয়ে সেই যোগাযোগ রক্ষা করবে।

- **বন্দিবিনিময় ও শরণার্থী প্রত্যাবাসন:** যেসব অঞ্চল আর্মেনিয়ার নিয়ন্ত্রণে ছিল সেখানে ও এর আশেপাশের জেলাগুলোতে শরণার্থীরা ফিরে আসতে পারবেন। বিবাদমান দুই পক্ষই একে অপরের হাতে থাকা যুদ্ধবন্দি, আটক ব্যক্তি ও মরদেহ বিনিময় করবে।

- **করিডোর:** মূল ভূমি থেকে দূরে আজারবাইজানের নাখচিভান স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে যাতায়াত করতে নিজেদের ভূমি ব্যবহার করার অনুমতি দিবে আর্মেনিয়া। যোগাযোগ অবকাঠামো তৈরির ব্যবস্থা নিতেও কাজ করবে দেশটি।

আজারবাইজান ও আর্মেনিয়া সংকট

❖ আজারবাইজান-আর্মেনিয়া দ্বন্দ্বে বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলোর ভূমিকা

তুরস্ক: এ যুদ্ধে তুরস্ক আজারবাইজানকে সরাসরি সর্বাত্মক সমর্থন দেয়। তুরস্কের বক্তব্য হচ্ছে, এত বছরের কূটনৈতিক চেষ্টা ও রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনার পরেও এই সংকটের কোনো সমাধান হয়নি। তাই তারা মনে করে নাগার্নো-কারাবাখের ওপর আন্তর্জাতিক স্বীকৃত আজারবাইজানীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। ২০১০ সালে তুরস্ক ও আজারবাইজান প্রতিরক্ষা সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর করে। ২০২০ সালের জুলাই মাসে আর্মেনিয়া-আজারবাইজানের মধ্যে ছোটখাটো যুদ্ধ ঘটে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর তুরস্কের পক্ষ থেকে আজারবাইজানকে বিভিন্ন রকমের সামরিক সহযোগিতাও দেওয়া হচ্ছে। তবে এই যুদ্ধে তুরস্ক কতোটা অগ্রসর হবে সেটা নির্ভর করে রাশিয়ার অবস্থানের উপরে। কারণ দক্ষিণ ককেশাসে আধিপত্য বিস্তার করে রাশিয়া। সেকারণে আঙ্কারা চাইবে না মস্কোর সঙ্গে সরাসরি সামরিক সংঘাতে জড়াতে। **তুরস্ক যেসব কারণে আজারবাইজানের পক্ষ নিচ্ছে, সেগুলো নিম্নরূপ:**

১. জ্বালানি স্বার্থ: ককেশাসের কিছু অঞ্চল জ্বালানির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, জ্বালানির উৎস এবং সরবরাহ ব্যবস্থা- এই দুই কারণেই। তুরস্ক তার এক-তৃতীয়াংশ গ্যাস আমদানি করে আজারবাইজানের কাছ থেকে। কাস্পিয়ান সাগরে পাওয়া তেলও আজারবাইজান তুরস্কের কাছে বিক্রি করে থাকে। আজারবাইজানের কারণে গ্যাসের জন্য রাশিয়ার ওপর তুরস্কের নির্ভরশীলতাও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে হ্রাস পেয়েছে। রাশিয়ার সাথে তুরস্কের জ্বালানি চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে ২০২১ সালে। আঙ্কারার পরিকল্পনা হচ্ছে এর পর তারা ট্রান্স আনাতোলিয়ান গ্যাস পাইপলাইন দিয়ে আজারবাইজান থেকে গ্যাস এনে তাদের চাহিদা পূরণ করবে। তুরস্কের জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য এটি তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আজারবাইজান থেকে জ্বালানির সরবরাহ যাতে বিঘ্নিত না হয় সেটা নিশ্চিত করার জন্য তুরস্ক যেকোন পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত।

২. ঐতিহাসিক কারণ: আজারবাইজানের সঙ্গে তুরস্কের সম্পর্ক ঐতিহাসিক। দুটো দেশ নিজেদের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে "এক জাতি, দুই দেশ" এই নীতিতে বিশ্বাসী। শুধু রাষ্ট্রীয় বা সরকারি পর্যায়ে নয়, তুরস্ক ও আজারবাইজানের সাধারণ জনগণও তাদেরকে একই জাতি বলে মনে করে।

আজারবাইজান ও আর্মেনিয়া সংকট

আর্মেনীয় গণহত্যা

তুরস্কের সাথে আর্মেনিয়ার সম্পর্ক ঐতিহাসিকভাবেই শত্রুতামূলক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় অটোমান তুর্কী শাসকদের হাতে বহু আর্মেনীয় নিহত হয়। আর্মেনিয়া একে গণহত্যা বলে উল্লেখ করলেও তুরস্ক একে গণহত্যা বলে স্বীকার করতে রাজি নয়। আর্মেনিয়ার দাবি যে অটোমান শাসকরা ১৯১৫-১৯১৭ সালের মধ্যে সুপরিকল্পিতভাবে ১৫ লাখ আর্মেনীয়কে হত্যা করেছে। বহু মানুষকে পাঠিয়েছে নির্বাসনে। অটোমান তুর্কী শাসকরা এই আর্মেনীয়দের সন্দেহ করতো। তারা মনে করতো খ্রিষ্টান আর্মেনীয়রা অটোমান খেলাফতের প্রতি যতটা অনুগত, তার চেয়েও অনেক বেশি অনুগত ছিল খ্রিষ্টান সরকারগুলোর প্রতি। গণহত্যার এই বিদ্বেষ এখনো রয়ে গিয়েছে।

অভ্যন্তরীণ রাজনীতি

আজারবাইজানকে অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক এমন কী সামরিক- যেকোন ধরনের সমর্থন দেওয়ার জন্য তুরস্কের রাজনৈতিক দলগুলোর দিক থেকেও সরকারের ওপর চাপ রয়েছে। বর্তমানে রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান নেতৃত্বাধীন ক্ষমতাসীন জাস্টিস এন্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টিসহ প্রধান বিরোধী দলও কট্টর তুর্কী জাতীয়তাবাদী দল। উভয়েই আজারবাইজানের পক্ষে।

এই যুদ্ধে তুরস্ক কতখানি অগ্রসর হবে সেটা পরিষ্কার নয়। ককেশাস মূলত রাশিয়ার প্রভাবাধীন অঞ্চল। তারা যদি সেখানে বড় ধরনের সামরিক সাফল্য আশা করে তাহলে মস্কোর সঙ্গে আঙ্কারার সম্পর্ক ঝুঁকির মুখে পড়বে। আর্মেনিয়ার সাথেও রাশিয়ার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক রয়েছে। সেদেশে রয়েছে তাদের সামরিক ঘাটিও। আজারবাইজানের সাথেও মস্কোর সম্পর্ক ভাল এবং দুটো দেশের কাছেই তারা অস্ত্র বিক্রি করে। বিশ্লেষকরা বলছেন, এই যুদ্ধে যদি তুরস্ক জড়িয়ে পড়ে তাহলে সেটা রাশিয়ার জন্য মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তাই দক্ষিণ ককেশাসে সামরিক অভিযানের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তুরস্ক নিশ্চয়ই রাশিয়ার কথা বিবেচনা করবে। অনেকে মনে করেন, এই যুদ্ধে তুরস্ক হস্তক্ষেপ করলে সেটা রাশিয়ার সঙ্গে সংঘাতের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিতে পারে। তাই এ ইস্যুতে সতর্ক আছে দুই পক্ষই।

আজারবাইজান ও আর্মেনিয়া সংকট

❖ **ইরান:** শিয়ারাষ্ট্র ইরান আজারবাইজান-আর্মেনিয়া যুদ্ধে আর্মেনিয়ার পক্ষাবলম্বন করে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশ্লেষকরা ইরানের অবস্থানের কয়েকটি কারণ চিহ্নিত করেছেন:

➢ **আজারি জাতীয়তাবাদের উত্থান:** আজারিরা মূলত তুর্কি বংশ। এদের পূর্বপুরুষ কয়েক শতাব্দী ধরে আজারবাইজান ও ইরান শাসন করেছিল। বলশেভিক বিপ্লবের পর রাশিয়া আজারবাইজান দখল করে নেয়। কাজার রাজ্যের অবশিষ্ট অংশ দখলে নেন পাহলভিরা। ফলে এই অঞ্চলের তুর্কমেনরা রাজ্যহারা হন। নব্বইয়ের দশকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে গেলে অন্যান্য সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের মতো আজারবাইজানও স্বাধীনতা লাভ করে। অবশিষ্ট আজারিদের অবস্থান ইরানে। উত্তর ইরানে আজারবাইজান নামে দুটি প্রদেশ আছে পূর্ব আজারবাইজান, রাজধানী তাবরিয, পশ্চিম আজারবাইজান, যার রাজধানী উর্মিয়া। এ দুই প্রদেশে প্রায় দুই কোটি আজারি-তুর্কি জনগোষ্ঠীর মানুষ আছে বলে বিভিন্ন হিসাবে পাওয়া যায়। বহু আজারি তাদের ভূখণ্ড দুই ভাগে বিভক্ত বলে মনে করেন।

➢ **আদর্শিক কারণ:** ইরান ধর্মতাত্ত্বিক শিয়ারাষ্ট্র। অন্যদিকে আজারবাইজান শিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও কট্টর সেকুলার রাষ্ট্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবরোধের কারণে ইরানে অর্থনীতি ভঙ্গুর অবস্থায় রয়েছে। জনগণের মাঝে অসন্তোষও আছে। এমতাবস্থায় নিজ দেশে সেকুলারিজমের প্রভাব রোধে ধর্মনিরপেক্ষ আজারবাইজানকে শক্তিশালী অবস্থায় দেখতে চায় না ইরান।

➢ **তুরস্কের প্রভাব রোধ করা:** তুরস্ক জোরালোভাবে আজারবাইজানকে সমর্থন করে। এটি তাদের একটি স্থায়ী নীতি। তুর্কিরা মনে করেন, আজারিরা তুর্কি বংশ, যদিও তারা ভিন্ন দেশে বসবাস করে। তুরস্ক তো প্রকাশ্য বলে আজারবাইজান ও তুরস্ক এক জাতি; দুই দেশ। এমতাবস্থায় আজারবাইজানের অবস্থান দৃঢ় হওয়ার মানেই হলো ওই অঞ্চলে তুরস্কের প্রভাব বৃদ্ধি, যা কোনোভাবেই মানতে চায় না ইরান। তার মানে ককেশাস অঞ্চলে রাষ্ট্রগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ে ধর্মের চেয়ে জাতীয়তাবোধের প্রভাব বেশি দেখা যাচ্ছে। এখানেই পালটে গেছে সম্পর্কের সমীকরণ

আজারবাইজান ও আর্মেনিয়া সংকট

❖ রাশিয়া

পরাশক্তি রাশিয়া ১৯২০ সালের দিকে সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের সময় মধ্য এশিয়ার সব দেশ সামরিক ও জনশক্তির জোরে দখল করে নেয়। ওই সময়ই ককেশাসের আজারবাইজান, আর্মেনিয়া ও জর্জিয়াও দখল করে নিজ সাম্রাজ্য ভুক্ত করে নিয়েছিল। তবে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর আজারবাইজান ও আর্মেনিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে। সোভিয়েতের পতনের পরও এ অঞ্চলে রাশিয়ার প্রভাব অব্যাহত রয়েছে। এই অঞ্চল বলতে গেলে এখন তাদের একচ্ছত্র অস্ত্রের বাজার। অন্যান্য সুযোগ সুবিধাও পাচ্ছে রাশিয়া। এই অঞ্চলে কিছু হলে তারাই নিজের প্রভাব খাটিয়ে মীমাংসা করে। তবে এই প্রভাব এখন ধীরে ধীরে কমে আসছে। আর্মেনিয়া-আজারবাইজান যুদ্ধেও তা দেখা গেছে।

❖ পাকিস্তান

বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, ৩০ বছরের আগেও যুদ্ধে আজারবাইজানকে যথাসাধ্য সাহায্য করেছে পাকিস্তান। ওই সময় পাকিস্তান নিজে বর্তমানের মতো শক্তিশালী ছিল না। পাকিস্তান বর্তমানে একমাত্র মুসলিম দেশ পরমাণু বোমার অধিকারী। তবে তারা চীনের সহায়তায় আরো অনেক অত্যাধুনিক অস্ত্রের অধিকারী। জেএফ-১৭ জঙ্গিবিমান, ট্যাঙ্ক, মিসাইলসহ অন্যান্য অস্ত্র তৈরীতে সক্ষম হয়েছে। এবার যুদ্ধ শুরু হওয়ার সাথে সাথে তুরস্কের পরেই পাকিস্তান আজারবাইজানকে পূর্বের মতই মুসলিম ভ্রাতৃপ্রতীম দেশ হিসাবে পূর্ণ সমর্থন জানায়। বিভিন্ন পত্রিকায় খবর এসেছে পাকিস্তানি সৈন্যরা আজারি সৈন্যদের সাথে আর্মেনিয়ার সাথে যুদ্ধ করছে। এমনকি আর্মেনিয়াও এ নিয়ে অভিযোগ করেছে। এ কারণে আজারবাইজানিরা যুদ্ধ চলা অবস্থায় অনেক বাসাবাড়িতে তুরস্কের পতাকার সাথে পাকিস্তানি পতাকাও উড়িয়েছে।

ভূমধ্যসাগর সংকট

চিত্র: ভূমধ্যসাগরের অবস্থান

আন্তর্জাতিক সমুদ্রসীমা আইন

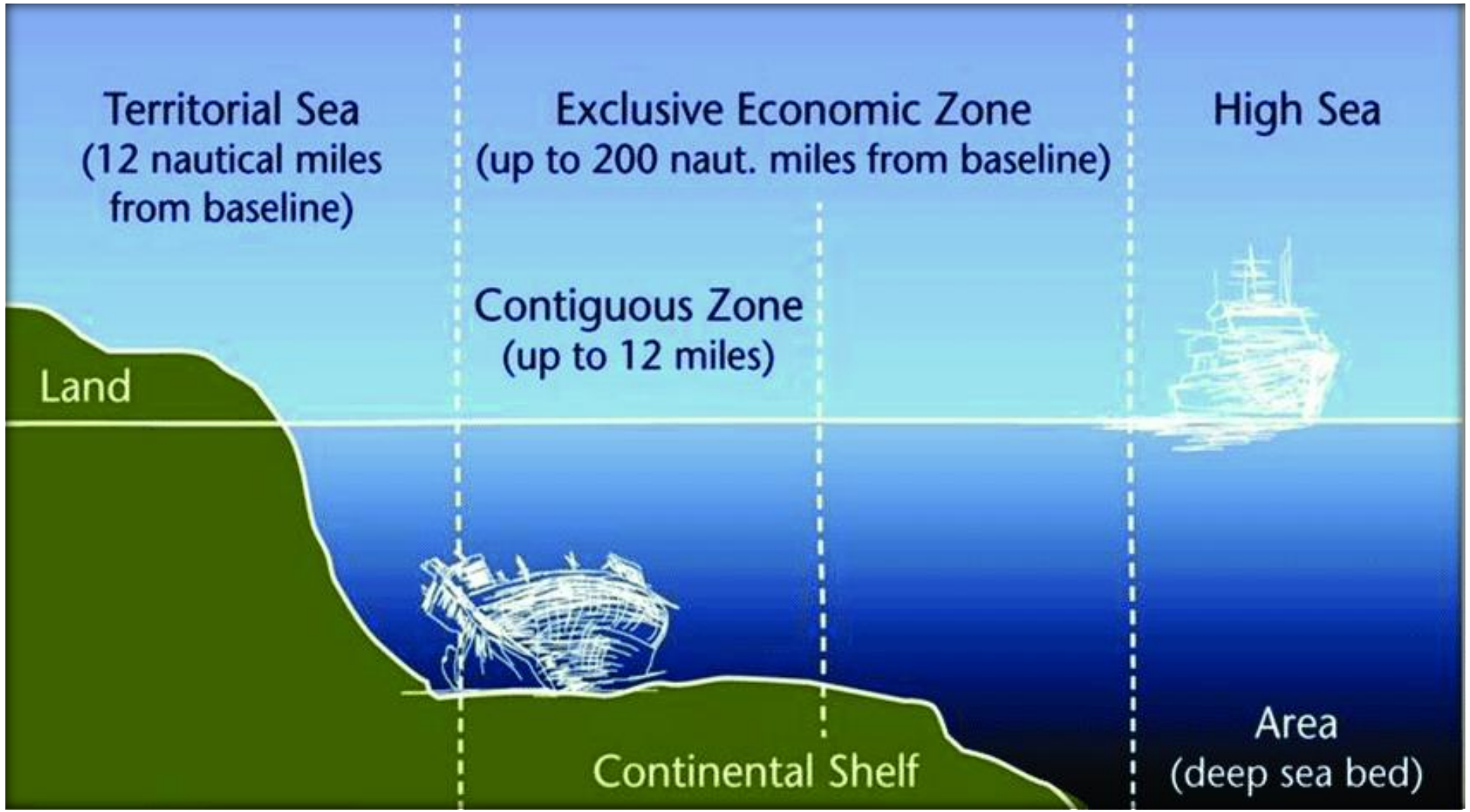

চিত্র: UNCLOS নির্ধারিত সমুদ্র-সীমা

ভূমধ্যসাগর সংকট

❖ তুরস্ক বনাম গ্রিস ও সাইপ্রাস শত্রুতা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার সেকাল-একাল

১৪৫৩ সালে অটোমানদের হাতে কনস্টান্টিনোপলের পতনের মাধ্যমে গ্রিস অটোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ১৮৩২ সালে Treaty of Constantinople এর মাধ্যমে গ্রিস অটোমানদের হতে স্বাধীনতা লাভ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অটোমানদের পরাজয় হলে মূলভূমি তুরস্ক ছাড়া সাম্রাজ্যের বাকি অংশ ব্রিটিশ আর ফ্রেঞ্চদের নিকট হাতছাড়া হয়ে যায়। এমনকি ব্রিটিশরা অটোমানদের রাজধানী ইস্তাম্বুল এবং বসফরাস ও দার্দানেলিস প্রণালিরও নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। আর তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রিস, ইতালি, ফ্রান্স ও আর্মেনিয়া তুরস্কের চতুর্মুখী দখল নেয়। অতঃপর, তুর্কিরা কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে গ্রিক, আর্মেনিয়ান আর ব্রিটিশদের হটিয়ে ১৯২৩ সালে স্বাধীনতা লাভ করে Treaty of Lausanne এর মাধ্যমে। এভাবে জন্মলগ্ন থেকেই গ্রিক-তুরস্ক শত্রুতার সৃষ্টি। এখনও সমুদ্র-সীমা, সাইপ্রাস প্রভৃতি নিয়ে তুরস্ক-গ্রিস দ্বন্দ্ব চলমান। এমনকি আজ পর্যন্ত তাদের মধ্যকার সমুদ্র-সীমাও নির্ধারিত হয়নি।

গ্রিস আন্তর্জাতিক সমুদ্র-সীমা আইন-১৯৮২ এর স্বাক্ষরকারী দেশ হলেও তুরস্ক এটিতে স্বাক্ষর করেনি। কারণ, তুরস্কের পশ্চিমের জলসীমায় পূর্ব ইজিয়ান সাগরে অনেকগুলো গ্রিক দ্বীপ রয়েছে যাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমুদ্র-সীমা যথাক্রমে ১২ ও ২০০ নটিক্যাল মাইল ধরা হলে তুরস্কের জলসীমার নিয়ন্ত্রণ মারাত্মক ভাবে ক্ষুণ্ন হয়। তাই তুরস্ক এই রাজনৈতিক সীমা ৬ নটিক্যাল মাইল বজায় রাখতে চাপ অব্যাহত রাখছে যা কয়েক দশক ধরে তুরস্ক ও গ্রিস উভয়ে মেনে আসছিল। কিন্তু গ্রিস তার সমুদ্র-সীমা এখন ১২ নটিক্যাল মাইল নির্ধারণের কথা বলছে। আবার, তুরস্ক-গ্রিস স্বাক্ষরিত বিভিন্ন চুক্তিতে পূর্ব ইজিয়ান সাগরের দ্বীপগুলোতে সামরিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হলেও বর্তমানে গ্রিসের অব্যাহত সামরিকীকরণ দুই দেশের সম্পর্কে আরও বিরূপ প্রভাব ফেলছে।

ভূমধ্যসাগর সংকট

সাইপ্রাস নিয়ে দ্বন্দ্ব

সাইপ্রাস সংখ্যাগুরু গ্রিক এবং সংখ্যালঘু তুর্কি জনগোষ্ঠীর একটি ভূ-মধ্যসাগরীয় দ্বীপ। এই দ্বীপটি ১৫৭১ সালে অটোমানরা দখল করে নেয়। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অটোমানদের পতন হলে দ্বীপটি সম্পূর্ণরূপে ব্রিটিশদের অধীনে চলে যায়। এরপর থেকেই শুরু হয় গ্রিক ও তুর্কি সাইপ্রিয়টদের বিভাজন। গ্রিক অর্থোডক্স চার্চ 'ইনোসিস (Enosis)' নামের একটি ধারণা সাইপ্রাসে গ্রিক সাইপ্রিয়টদের মাঝে ছড়িয়ে দেয় যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে সাইপ্রাসকে গ্রিসের সাথে সংযুক্তিকরণ। ১৯৫০ এর দশকে সাইপ্রাস অর্থোডক্স চার্চ এবং গ্রিকপন্থি সাইপ্রিয়টদের 'EOKA' নামক একটি চরমপন্থি সংগঠন ইনোসিস বাস্তবায়নে সহিংস কার্যক্রম শুরু করে। ফলশ্রুতিতে বহু ব্রিটিশ ও তুর্কি সাইপ্রিয়ট সহিংসতার শিকার হয়। অবশেষে, জুরিখ চুক্তির মাধ্যমে ১৯৬০ সালে ব্রিটিশদের থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন রিপাবলিক অব সাইপ্রাস গঠিত হয়।

নব-রচিত সংবিধানে তুর্কি সাইপ্রিয়টদের অধিকার সংরক্ষিত করা হয়েছিল এবং গ্রিস ও তুরস্ককে এই দ্বীপের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তব অবস্থা আরও খারাপের দিকে যাচ্ছিল। গ্রিকপন্থি সাইপ্রিয়টরা সংখ্যালঘু তুর্কি সাইপ্রিয়টদের হত্যা এবং বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করতে থাকে এবং ১৯৬৩ সাল থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত গ্রিস ২০,০০০ সেনা প্রেরণ করে। অবশেষে জাতিসংঘ ১৯৬৪ সালে শান্তিরক্ষা বাহিনী প্রেরণ করে যা আজ পর্যন্ত বলবৎ রয়েছে।

কিন্তু গ্রিকপন্থি সাইপ্রিয়টরা সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করলে সাইপ্রাস গ্রিসের অধীনে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। ফলে তুরস্ক সাইপ্রাসে সামরিক অভিযান চালায় এবং দ্বীপটির উত্তর অংশ দখলে নেয়। ১৯৮৩ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে এই উত্তর অংশটি 'Turkish Republic of Northern Cyprus' নামে আত্মপ্রকাশ করে এবং আজ অবধি শুধুমাত্র তুরস্ক তাকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

ভূমধ্যসাগর সংকট

অন্যদিকে গ্রিক অধ্যুষিত রিপাবলিক অব সাইপ্রাস নামে পরিচিত দ্বীপের দক্ষিণ অংশ জাতিসংঘ ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন-ভুক্ত একটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি-প্রাপ্ত রাষ্ট্র। ২০০৪ সালে দুই অংশকে একত্রীকরণের লক্ষ্যে জাতিসংঘের অধীনে একটি গণভোট আয়োজিত হয়েছিল। উত্তর সাইপ্রাসের ৬৫% জনগণ 'হ্যাঁ' ভোট দিলেও দক্ষিণের ৭৬% জনগণ 'না' ভোট দেয়। ফলে একত্রীকরণ সম্ভব হয়নি। ফলে তুরস্ক এবং নর্দার্ন সাইপ্রাসের সাথে সাইপ্রাসের সমুদ্র-সীমা নিয়ে চরম বিরোধ রয়েছে।

সাইপ্রাসের সমুদ্র-সীমার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ তুরস্ক ও নর্দার্ন সাইপ্রাস দাবি করে। সাইপ্রাস তার দাবীকৃত এলাকায় আমেরিকান কোম্পানি এক্সন মবিল, ফ্রেঞ্চ কোম্পানি টোটাল এবং ইতালিয়ান কোম্পানি এনিকে গ্যাস অনুসন্ধানের দায়িত্ব দিয়েছে। অন্যদিকে, তুরস্ক এই বিবদমান এলাকায় নিজেদের কোম্পানিকে অনুসন্ধানের জন্য পাঠিয়েছে। এই নিয়ে সেখানে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। গ্রিস এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন সাইপ্রাসকে সমর্থন দিচ্ছে। উত্তর সাইপ্রাসে এখনও তুরস্কের ৪০,০০০ সেনা মোতায়েন রয়েছে সম্ভাব্য গ্রিক হস্তক্ষেপ রোধ করার জন্য। মূলত, পূর্ব ভূমধ্যসাগরে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় তুরস্ক ও গ্রিস যথাক্রমে নর্দার্ন সাইপ্রাস ও সাইপ্রাসকে প্রক্সি হিসেবে ব্যবহার করছে।

ভূমধ্যসাগর সংকট

ইসরায়েল-লেবানন বৈরিতা

ইসরায়েল-লেবানন দ্বৈরথ এখন স্থলযুদ্ধ থেকে জলসীমায় এসে ঠেকেছে। ১৯৪৮ সালে ইসরায়েল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে ১৯৮২ পর্যন্ত দুই দেশ বড় কোনো বিরোধে না জড়ালেও সম্পর্ক ভালো ছিল না। ১৯৮২ সালে ইসরায়েল দক্ষিণ লেবানন আক্রমণ করে যার ফলশ্রুতিতে হিজবুল্লার জন্ম হয়। ২০০০ সালে ইসরায়েল দক্ষিণ লেবানন ত্যাগ করে এবং জাতিসংঘ দুই দেশের মাঝে ব্লু লাইন নামক একটি সীমান্ত রেখা প্রতিষ্ঠা করে যা শান্তিরক্ষা মিশন United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) রক্ষণাবেক্ষণ করে আসছে।

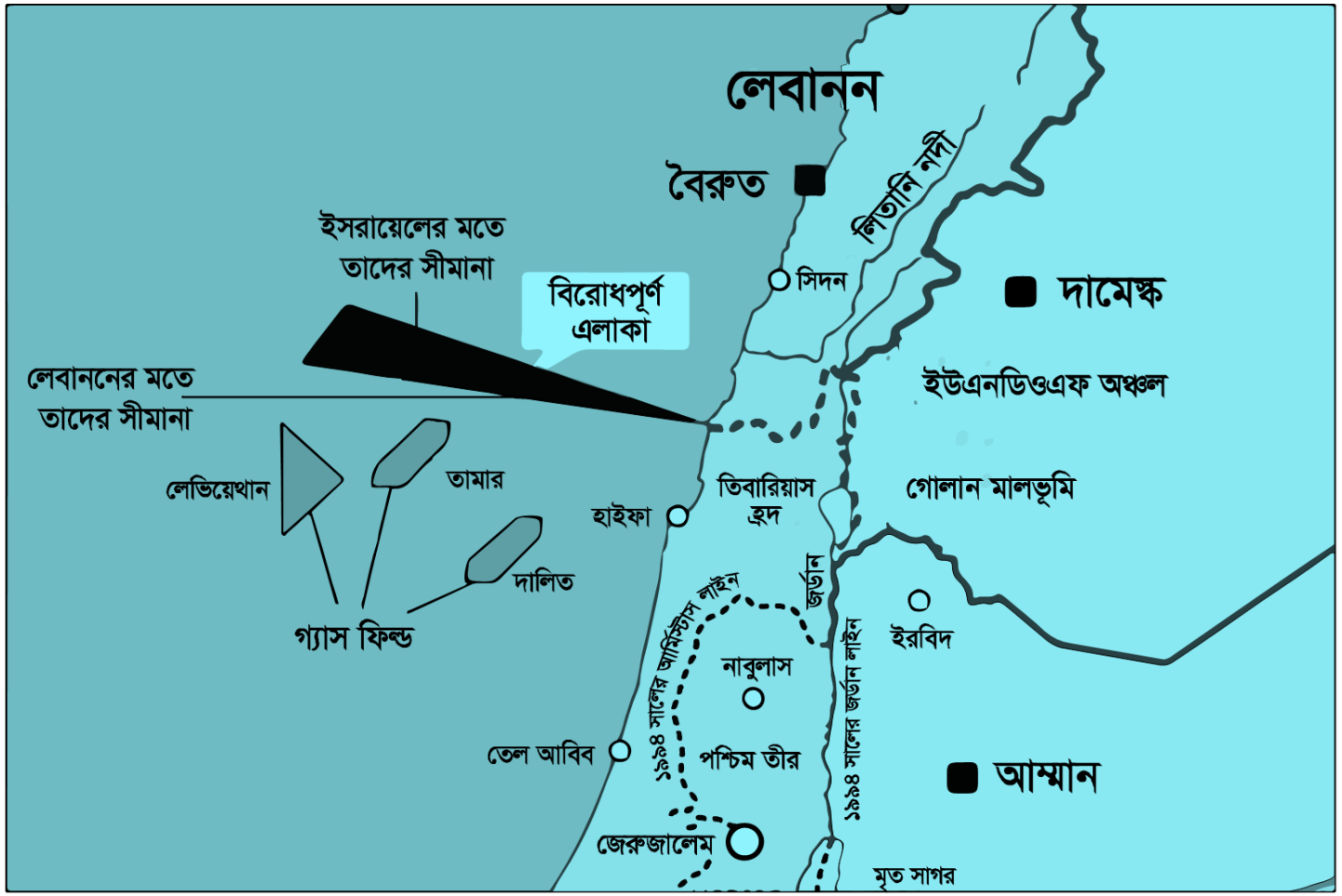

চিত্র: ইসরায়েল-লেবাননের বিরোধপূর্ণ সমুদ্র-সীমা এলাকা (কালো) চিহ্নিত)

ভূমধ্যসাগর সংকট

কিন্তু ২০০৬ সালে ইসরায়েল ও হিজবুল্লার মধ্যে বড় ধরনের যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তারপর থেকেই সীমান্তে উত্তেজনা ও সংঘর্ষ বিদ্যমান রয়েছে।

এখন নতুন করে যুক্ত হয়েছে সমুদ্র-সীমা বিরোধ। ২০০৮ সালে লেবানন সাইপ্রাসের সাথে তার সমুদ্র-সীমা নির্ধারণ করে। কিন্তু সমস্যা হলো, ২০০৯ সালে লেবাননের দক্ষিণের জল-সীমানার ৮৫০ বর্গকিলোমিটার বিতর্কিত এলাকা ইসরায়েল নিজের বলে দাবি করে। লেবানন বিষয়টি জাতিসংঘে নিয়ে যায় এবং যুক্তরাষ্ট্র এতে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে আবির্ভূত হয়। যুক্তরাষ্ট্র ৮৫০ বর্গ কি.মি. এলাকাকে দুইটি অংশে ভাগ করে দেয় যার মধ্যে ৪৬৮ বর্গ কি.মি. এলাকা লেবাননকে এবং ৩৯২ বর্গ কি.মি. এলাকা ইসরায়েলকে দেয়ার প্রস্তাব করা হয়।

কিন্তু লেবানন এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। কারণ তাদের মতে যেখানে ইসরায়েলের অধিকারই নেই, সেখানে অবৈধ দাবি উত্থাপন করে আমেরিকার মাধ্যমে প্রায় ৫০% সমুদ্র এলাকা ইসরায়েল নিজের করে নিচ্ছে। উল্লেখ্য, লেবানন রাষ্ট্র হিসেবে ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দেয়নি। উপরন্তু, ইসরায়েল আন্তর্জাতিক সমুদ্র-সীমা আইন-১৯৮২ তেও স্বাক্ষর করেনি। ২০১৩ সালের আমেরিকার এই মধ্যস্থতা ব্যর্থ হওয়ার পর থেকে আইনি প্রক্রিয়ায় সমাধানের আশা কমে যায়। ২০১৮ সালে ফ্রান্সের টোটাল, ইতালির এনি এবং রাশিয়ার নোভাটেক কোম্পানিকে গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনের দায়িত্ব দিয়েছে লেবানন।

ভূমধ্যসাগর সংকট

ইস্টমেড গ্যাস পাইপলাইন চুক্তি-২০২০

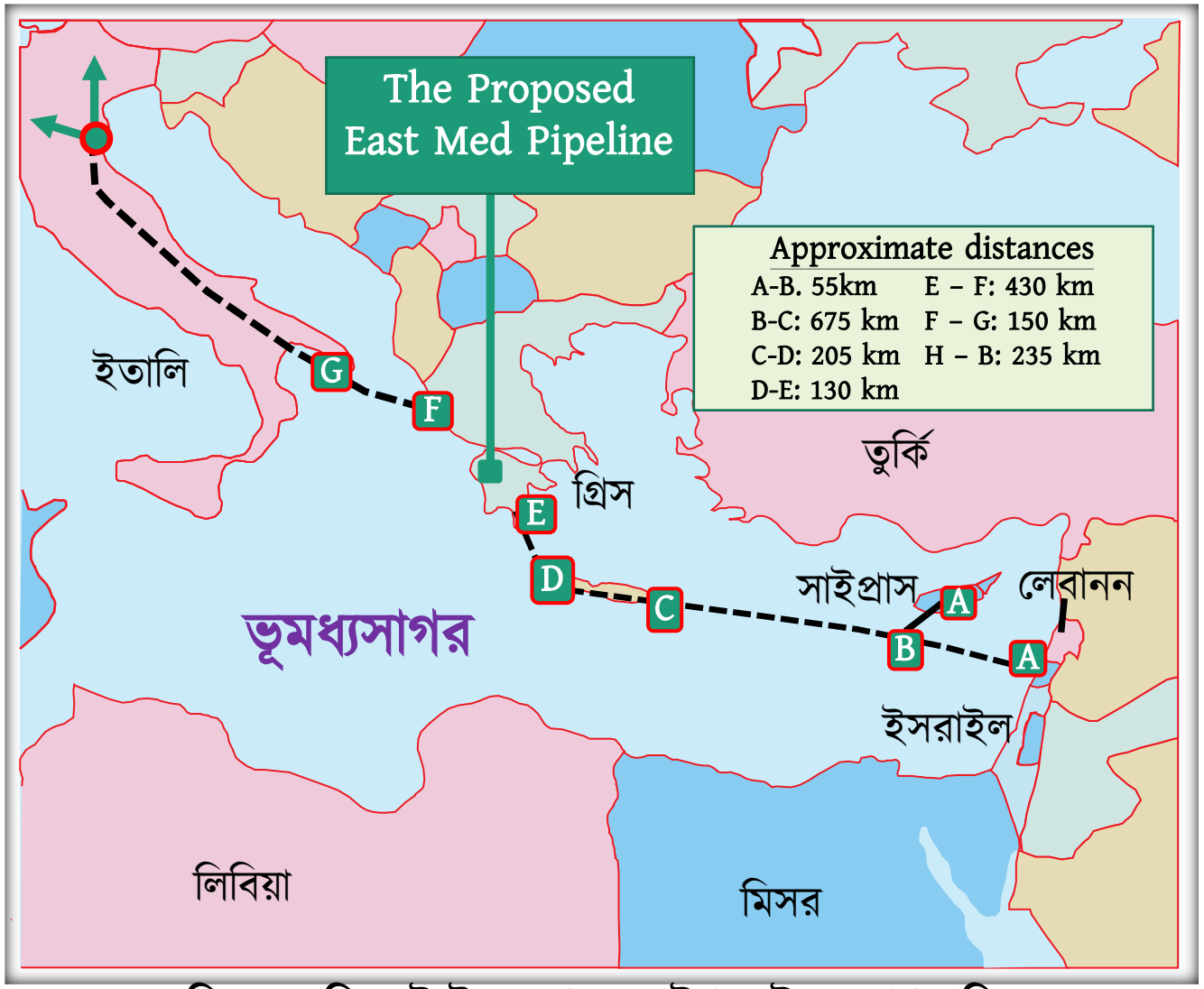

চিত্র: মানচিত্রে ইস্টমেড গ্যাস পাইপ লাইনের পথ-পরিক্রমা

ভূমধ্যসাগর সংকট

MOU চুক্তি বনাম ইস্টমেড পাইপলাইন চুক্তি

তুরস্ক-লিবিয়া চুক্তিটি গ্রিসের ক্রিট দ্বীপের অর্থনৈতিক সমুদ্র-সীমাকে উপেক্ষা করেই হয়েছে। গ্রিসে লিবিয়ার রাষ্ট্রদূতকে বহিষ্কার করা হয়েছে এবং গ্রিসের সমুদ্র-সীমায় তুরস্কের কোন অনুসন্ধানমূলক কার্যক্রম দেখলেই সামরিক পদক্ষেপ নেওয়ার হুমকি দেয়া হয়েছে। আবার, তুরস্ক লিবিয়ার জিএনএ সরকারকে সামরিকভাবে সহায়তা করায় ক্ষেপে গিয়েছে লিবিয়ার গৃহযুদ্ধের অপর পক্ষ জেনারেল হাফতার ও তার সমর্থনদানকারী দেশ মিশর ও ফ্রান্স। চুক্তির পরপরই গ্রিক পররাষ্ট্রমন্ত্রী লিবিয়া এবং মিশর সফর করেন। হাফতার এই চুক্তি প্রত্যাখ্যান করেন এবং মিশরও একই অবস্থান নেয়। উপরন্তু এই চুক্তি ইস্টমেড পাইপলাইনের প্রতি একটি বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে যা ইসরায়েলকেও ক্ষুব্ধ করে তুলেছে।অন্যদিকে তুরস্ক এই চুক্তির মাধ্যমে জানান দিচ্ছে যে, ইস্টমেড পাইপলাইন 'ইসরায়েল-সাইপ্রাস-ক্রিট দ্বীপ-গ্রিস-ইতালি' রুটের পরিবর্তে 'ইসরায়েল-সাইপ্রাস-তুরস্ক- ইউরোপ'রুট দিয়ে যেতে হবে। ফলে দুই পরস্পরবিরোধী চুক্তি এবং তার স্বাক্ষরকারী ও সমর্থনকারী দেশগুলো এক ধরনের মুখোমুখি অবস্থানে চলে এসেছে।

ভূমধ্যসাগর সংকট

মিশর-ইসরায়েল গ্যাস পাইপলাইন চুক্তি

ভূমধ্যসাগরে আবিষ্কৃত সবচেয়ে বড় গ্যাস-ফিল্ড মিশরের। পূর্ব ভূ-মধ্যসাগরীয় গ্যাস ফোরামের উদ্যোক্তা দেশও মিশর। ইসরায়েল-জর্ডান চুক্তির মতোই ২০১৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় স্বাক্ষরিত হয় ইসরায়েল-মিশর গ্যাস চুক্তি। চুক্তি অনুযায়ী, ২০ বিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে আগামী ১৫ বছরে ইসরায়েল মিশরে ৮৫ বিলিয়ন কিউবিক মিটার গ্যাস রপ্তানি করবে। মিশর এই আমদানিকৃত গ্যাসের একটি অংশ স্থানীয় চাহিদা মেটাতে এবং বাকি অংশ তরলীকরণ করে এলএনজি রূপে ইউরোপে রপ্তানি করবে। কারণ মিশরের ২টি এলএনজি প্ল্যান্ট রয়েছে যা এই অঞ্চলের অন্য কারো নেই। সবচেয়ে বড় গ্যাস-ফিল্ড আবিষ্কার এবং ইসরায়েল থেকে আমদানিকৃত গ্যাস পুনঃ-রপ্তানির মাধ্যমে পূর্ব ভূমধ্যসাগরের এনার্জি হাব হওয়ার স্বপ্ন দেখছে মিশর। তবে ইস্টমেড পাইপলাইন প্রজেক্টে মিশর অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় তার সেই স্বপ্ন কতটুকু বাস্তবায়নযোগ্য তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। ফলে আমেরিকার মধ্যস্থতায় মিশর ও জর্ডানে এবং ইস্টমেড পাইপলাইনের মাধ্যমে ইউরোপে গ্যাস রপ্তানির মাধ্যমে ইসরায়েলই হয়ে উঠছে এই অঞ্চলের প্রকৃত শক্তিকেন্দ্র।

ভূমধ্যসাগর সংকট

ভূমধ্যসাগর জটিলতায় রাশিয়া ও আমেরিকার ভূমিকা

ভূমধ্যসাগরের এরকম এক জটিল ভূরাজনৈতিক খেলায় দুই বিশ্ব মোড়ল যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার ভূমিকাও রয়েছে। এখানে কে কাকে টেক্কা দেবে তা নিয়ে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। আমেরিকা সমর্থিত ইস্টমেড গ্যাস পাইপলাইন হয়ে উঠতে পারে রাশিয়ার গলার কাঁটা। ইউরোপের জ্বালানি চাহিদার প্রায় ৭৭% ই আমদানিকৃত। আর ইউরোপে গ্যাসের সবচেয়ে বড় সরবরাহকারী দেশ হল রাশিয়া। ভৌগোলিক দিক থেকে কাছে হওয়ায় পাইপলাইনের মাধ্যমে ইউরোপের প্রায় ৪৩% গ্যাসের চাহিদা মেটায় রাশিয়া। কিন্তু এই ৪৩% গ্যাস আটলান্টিকের অপর পাড়ের দেশ আমেরিকা থেকে এলএনজি রূপে আমদানি করলে ইউরোপের ব্যয় বহুগুণে বেড়ে যেত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ইউরোপ রাশিয়ার গ্যাসের উপর নির্ভরশীল হওয়ার কারণে রাশিয়া তার রাজনৈতিক প্রভাব অব্যাহত রাখতে পারছে। তাই ইউরোপ বিকল্প কোনও দেশ থেকে পাইপলাইন দিয়ে গ্যাস আমদানি করার মাধ্যমে রাশিয়ার উপর নির্ভরশীলতা কমাতে চাইছে। আর এ উদ্যোগকে আমেরিকা তার সর্বস্ব দিয়ে সাহায্য করছে।

ভূমধ্যসাগর সংকট

২০১৪ সালে ইউক্রেন সংকটকালে আমেরিকা ইউক্রেনকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে সাহায্য করেছে। রাশিয়া থেকে ইউক্রেন হয়ে ইউরোপে গ্যাস পাইপলাইন তখন বন্ধ করে দেয়া হয়। ফলে ইউরোপে গ্যাস সরবরাহ নিয়ে বিপাকে পড়ে রাশিয়া। কিন্তু রাশিয়া নতুন ২ টি পাইপলাইন নির্মাণের মাধ্যমে তার সরবরাহ অব্যাহত রেখেছে। একটি হলো তুরস্ক হয়ে ইউরোপে প্রবেশকারী ৯০০ কি.মি. দীর্ঘ টার্ক-স্ট্রিম পাইপলাইন যা কৃষ্ণ সাগরের নিচ দিয়ে গেছে। অন্যটি হলো, জার্মানি হয়ে ইউরোপে প্রবেশকারী নর্ড-স্ট্রিম পাইপলাইন যা বাল্টিক সাগরের নিচ দিয়ে গেছে। অপরদিকে সিরিয়াতে রাশিয়া, কাতার এবং ইরানকে হটিয়ে জ্বালানির নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে এবং ২০১৩ সালের ডিসেম্বরে পূর্ব ভূমধ্যসাগরে সিরিয়ান জলসীমায় গ্যাস সম্পর্কিত বিষয়ে রাশিয়ান কোম্পানি Soyuzneftgaz ২৫ বছরের চুক্তিও করেছে। কিন্তু ইউরোপ রাশিয়ার গ্যাসের উপর নির্ভরতা কমাতে বিকল্প প্রজেক্ট হাতে নিয়েছে এবং অবধারিতভাবে আমেরিকারও এতে সমর্থন রয়েছে। সাউদার্ন গ্যাস করিডর নামে পরিচিত এই প্রজেক্টটি বাস্তবায়িত হলে আজারবাইজান হতে গ্যাস পাইপলাইনের মাধ্যমে ইউরোপে পৌঁছাবে। তুর্কমেনিস্তান-আজারবাইজান রুটে ট্রান্স-কাস্পিয়ান পাইপলাইন, আজারবাইজান-জর্জিয়া-তুরস্ক রুটে ট্রান্স-আনাতোলিয়ান পাইপলাইন (Trans-anatolian pipeline -TANAP) এবং তুরস্ক-গ্রিস-ইতালি রুটে 'Trans-adriatic sea pipeline' প্রতিষ্ঠা হলো এই প্রজেক্টের মূল উদ্দেশ্য। লক্ষণীয় বিষয় হলো, তুরস্ক রাশিয়া সমর্থিত টার্ক-স্ট্রিম পাইপলাইন এবং আমেরিকা সমর্থিত TANAP নির্মাণের মাধ্যমে উভয় দিকেই সমতা রক্ষা করছে। এই প্রেক্ষাপটে আমেরিকা সমর্থিত ইস্টমেড গ্যাস পাইপলাইন এবং সাউদার্ন গ্যাস করিডর ইউরোপের জ্বালানি চাহিদা অনেকাংশে মেটাবে যা রাশিয়ার অন্যতম ভালো বিকল্প।

বাণিজ্য যুদ্ধ

❖ যুক্তরাষ্ট্র - চীনের বাণিজ্য যুদ্ধের ক্রমবিকাশ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংরক্ষণবাদী ভাবাদর্শের সমতলে চীনও নিয়ম বহির্ভূত বাণিজ্য চালানো শুরু করছে। এটিই দুই দেশের বাণিজ্য যুদ্ধকে উসকে দিচ্ছে। ১৯৭২ সালে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের বেইজিং সফরের মাধ্যমে আমেরিকার সাথে চীনের সম্পর্কের যাত্রা শুরু হয়। এই সম্পর্কের মধ্য দিয়ে উভয় দেশ কৌশলগতভাবে অনেক লাভবান হয়েছে। মূলত যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতায় ১৯৭২ সালে চীন জাতিসংঘের সদস্য পদসহ নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হয়েছে এবং তাইওয়ানের উপর চীনের সার্বভৌমত্বের দাবি স্বীকৃত হয়েছে।

চীন মনে করে চীনের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক উভয় দেশের পাশাপাশি বিশ্ব অর্থনীতির স্থিতিশীলতা ও উন্নয়নের জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২০১৭ সালে সাবেক মার্কিন প্রশাসন ফার্স্ট নীতি গ্রহণ করে এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে নির্দেশ করে এমন পারস্পরিক শ্রদ্ধার মৌলিক নীতিগুলোকে বর্জন করে। এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র একতরফা নীতি প্রচার আরম্ভ করে এবং অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তার শুরু করে। সেইসাথে বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনে অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ বিশেষ করে চীনের উপর শুল্কারোপের এবং চীনের ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যাপক চাপ প্রয়োগ করা শুরু করে। এ কারণে দুই পক্ষের মধ্যে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব অল্প সময়ের মধ্যে দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি বহুমুখী বাণিজ্য ব্যবস্থা এবং মুক্ত বাণিজ্যের নীতির জন্যে হুমকির সৃষ্টি করেছে।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনী প্রচারণার সময় চীনের কড়া সমালোচনা করেছিলেন সাবেক ট্রাম্প প্রশাসন। চীনের উপর ট্রাম্পের এই ক্ষোভের প্রধান কারণ হলো উত্তর কোরিয়া। উত্তর কোরিয়া বিষয়ে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে চীনের উপর ভরসা করেছিলেন ট্রাম্প। কিন্তু তার ভাষায় চীন ব্যর্থ হয়েছে। এছাড়া ট্রাম্প প্রশাসনের বিশ্বায়ন ও পরিবেশ নীতিকে সমর্থন করেনি চীন।

বাণিজ্য যুদ্ধ

❖ যুক্তরাষ্ট্র-চীন বাণিজ্য যুদ্ধের স্বরূপ

গত ৫০০ বছরে প্রায় ১৬টি বাণিজ্য যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে যার ১২টি নিষ্পত্তি হয়েছে যুদ্ধের দ্বারা। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আমেরিকাকে মহান করা অর্থাৎ অর্থনৈতিকভাবে আমেরিকাকে প্রমাণ করার জন্যে বিভিন্ন নীতি গ্রহণ করেছে। তাদের অভিমত, আমেরিকান পণ্যের উপর বিপুল করারোপ করে আমেরিকান বাণিজ্য ঘাটতি বিপুলাংশে বাড়িয়ে দেওয়ার জন্যে চীন দায়ী। এজন্য ২০১৮ সালের ২৩ মার্চ ট্রাম্প প্রশাসন সর্বপ্রথম লোহা ও অ্যালুমিনিয়াম পণ্যের উপর যথাক্রমে ২৫% ও ৪০% শুল্কারোপ ঘোষণা করে। এটি প্রায় ৫০ বিলিয়ন ডলার সমান আমদানিকৃত চীনা পণ্যের উপর কার্যকর হয়। এর জবাবে ২০১৮ সালের এপ্রিলে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করা ১২৮টি পণ্যের উপর ২৫% শুল্ক বৃদ্ধি করে চীন। যার আর্থিক পরিমাণ প্রায় ৩০০ কোটি মার্কিন ডলার। এ পরিস্থিতিতে বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতির দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য যুদ্ধের উপক্রম হয়।

২০১৮ সালের মে মাসে দুই দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনার পর সম্ভাব্য বাণিজ্য যুদ্ধ স্থগিতের ঘোষণা দেওয়া হয়। কিন্তু ১৫ জুন, ২০১৮ সালে ট্রাম্প প্রশাসন ৫০০০ কোটি ডলারের চীনা পণ্যের উপর নতুন করে ২৫% আমদানি শুল্ক আরোপ করে। ৬ জুলাই, ২০১৮ বার্ষিক ৩৪০০ কোটি ডলার বাণিজ্য হয় এমন ৮১৮ চীনা পণ্যের উপর ২৫% শুল্ক কার্যকর হয়। একই দিন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের ৫৪৫টি পণ্যের উপরও চীনের ২৫% শুল্ক আদায় শুরু হয়। আর এই পাল্টাপাল্টি শুল্ক আরোপের মধ্য দিয়ে শুরু হয়ে যায় চীন-যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বাণিজ্য যুদ্ধ।

বিশ্বের সবচেয়ে বড় দুই অর্থনীতির পাল্টাপাল্টি পদক্ষেপে বিশ্ব অর্থনীতি এখন হুমকির সম্মুখীন। গোটা বিশ্ব এই বাণিজ্য যুদ্ধের কারণে উদ্বিগ্ন ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। এরই মধ্যে বিশ্ব অর্থনীতিতে এ অশুভ বাণিজ্য যুদ্ধের বিরূপ প্রভাব পড়তে শুরু করছে।

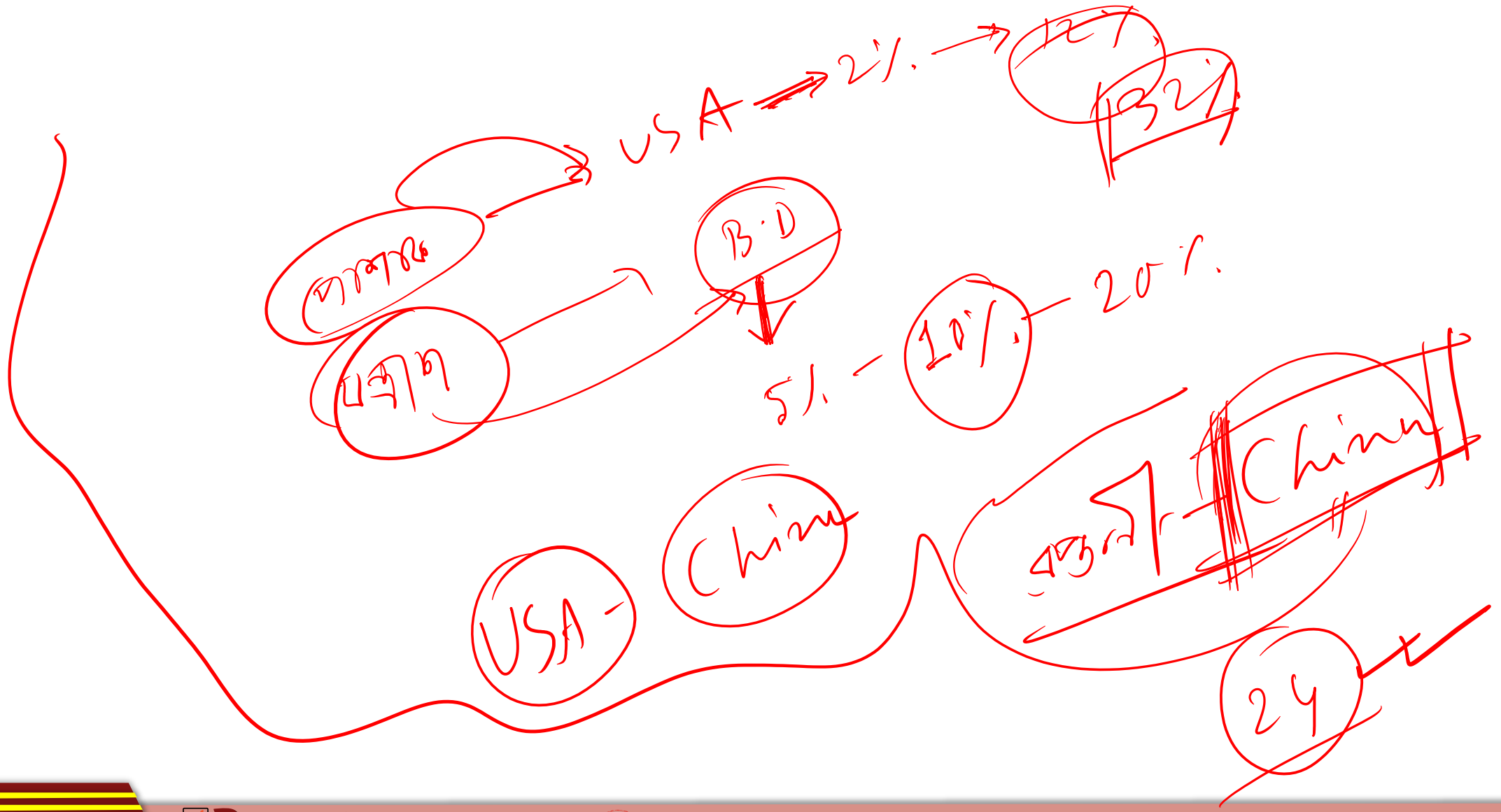

USA
2%
12%
32%
B.D
5% - 10% - 20%
USA - China
China
24

বাণিজ্য যুদ্ধ

❖ আন্তর্জাতিক বাজার ও বিশ্ব অর্থনীতিতে বাণিজ্য যুদ্ধের প্রভাব

- পৃথিবীর শীর্ষ দুই অর্থনীতির দেশ যথাক্রমে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের বাণিজ্য যুদ্ধের কারণে আন্তর্জাতিক বাজারও টালমাটাল। এই দুই দেশের বাণিজ্য যুদ্ধের নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে এশিয়া ও ইউরোপের নানা দেশের উপর। যুক্তরাষ্ট্রে অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের ফলে ক্ষতির মুখ দেখছে নিম্ন আয়ের দেশগুলো।
- আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যুক্তরাষ্ট্র সবচেয়ে বড় বাজার। বাণিজ্য যুদ্ধের কারণে অস্থিতিশিল আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের সঠিক দামে ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে না। অনেক দেশই এ পরিস্থিতিতে ভিন্ন পথ বেছে নিচ্ছে লোকসানের সম্মুখীন হয়ে আমদানিকারক দেশগুলো এখন ইউরোপের দেশগুলোর প্রতি আগ্রহী হয়ে পড়ছে। এদিকে ট্রাম্প প্রশাসনের আক্রমণাত্মক বাণিজ্য নীতির বিরুদ্ধে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোকে নিয়ে জোট গঠনের জোর চেষ্টা চালাচ্ছে চীন।
- বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও বিশ্লেষকদের আশঙ্কা বাণিজ্য যুদ্ধ বিশ্বজুড়ে বড় অর্থনৈতিক মন্দার সৃষ্টি করবে। দেশে দেশে কর্মসংস্থান আর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিয়ে উদ্বেগ বেড়ে গেছে। হংকং ও সিঙ্গাপুরের মতো, এশিয়ার তুলনামূলক ছোট অর্থনীতির দেশগুলো বড় ঝুঁকির মধ্যে আছে বলে মনে করা হচ্ছে। এ বাণিজ্য যুদ্ধ অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
- অন্যদিকে দ্রব্যমূল্যেরও উর্ধ্বগতি হবে। ফলে ভোক্তাদের সেই পণ্য বা সেবা অধিক দামে কিনতে বাধ্য হতে হবে।
- অর্থনীতিবিদ মরগান স্ট্যানলির মতে, চীন-যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কারোপের কারণে বিশ্ব বাণিজ্যে ০.৬% এবং বৈশ্বিক জিডিপিতে ০.১% প্রভাব পড়েছে। বাণিজ্য যুদ্ধের কারণে বিনিয়োগকারীরা দ্বিধায় পড়বে এবং তাদের বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত বিলম্বিত হবে। আবার অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান চীন বা যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে সরে যাবে। ফলে অর্থনৈতিক ঘাটতি ও বেকারত্বের সংখ্যা বাড়বে। এছাড়াও এই যুদ্ধের মূল প্রভাব পড়বে দুই দেশের শ্রমজীবীদের উপর।

বাণিজ্য যুদ্ধ

❖ বাণিজ্য যুদ্ধের ভবিষ্যৎ

বিশ্ব অর্থনীতির দুই পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে প্রায় দুই বছর ধরে বাণিজ্য যুদ্ধ চলার পর ১৫ জানুয়ারি ২০২০ হোয়াইট হাউসে উভয় পক্ষের মাঝে স্বাক্ষরিত হয় প্রথম ধাপের বাণিজ্য চুক্তি। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও চীনের উপ-প্রধানমন্ত্রী লিউ হের মধ্যে সম্পাদিত হয় ঐতিহাসিক এই চুক্তি। চুক্তি অনুসারে, ২০১৭ সালের চেয়ে কমপক্ষে ২০,০০০ কোটি ডলারের মার্কিন পণ্য বেশি আমদানি করবে চীন, পণ্য নকল করার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বেইজিং এবং দেশদ্বয়ের মধ্যে কিছু ক্ষেত্রে ২৫% শুল্ক আরোপ বহাল থাকবে। চুক্তিতে আরো শুল্ক হ্রাসের সময়সীমা, আর্থিক পরিষেবা বা হুয়াওয়ের নিষেধাজ্ঞা নিয়ে কোনো আলোচনা নেই। চীন-মার্কিন এই বাণিজ্য চুক্তির ১ম ধাপ শেষে তাই বিরোধ নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছে বলা যাবে না। এখনো এই বাণিজ্য যুদ্ধ স্তিমিত অবস্থায় আছে।

Phase One এই চুক্তির পরেও যুক্তরাষ্ট্রের নতুন কিছু নিষেধাজ্ঞা এবং শুল্কারোপ এই যুদ্ধকে নতুন করে ভাবিয়ে তুলছে। সর্বশেষ ২০২১ সালের ২০ জানুয়ারি নতুন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ক্ষমতায় আসে। তিনি পূর্বের শুল্কারোপ মিত্রদের সাথে আলোচনা না করে এবং পরবর্তী বিশ্লেষণ না করা পর্যন্ত বহাল রাখার আদেশ দেন। এ থেকে ধারণা করা যায় যে বাণিজ্য যুদ্ধের শীঘ্রই অবসান হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। বিশ্ব অর্থনীতি এবং আন্তর্জাতিক বাজারকে স্থিতিশীল রাখতে হলে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মাঝে বাণিজ্যযুদ্ধ যেকোনো মূল্যে এড়াতে হবে। এখন পর্যন্ত যতদূর দেখা যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র ও চীন আলোচনার টেবিলে ফিরে আসা পর্যন্ত আরও অনেক বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতা ঘোষিত হতে পারে। এতে অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাবে এবং কোন সুফল দৃশ্যমান হবে না।

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- মিয়ানমারের বর্তমান রাজনৈতিক সংকট কি আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্য হুমকি? আপনার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন। [৪৪তম বিসিএস]
- মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি তেহরান ও সৌদি আরবের মধ্যকার প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলাফল বিশ্লেষণ করুন। এ অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার ভূমিকা মূল্যায়ন করুন। [৪০তম বিসিএস লিখিত]
- সিরিয়া যুদ্ধে শিয়াদের সম্পৃক্ততার ফলে যুদ্ধের সম্ভাব্য পরিণতিতে কী ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে বলে আপনি মনে করেন? [৩৮তম বিসিএস লিখিত]
- সিরিয়া সংকটের ভবিষ্যৎ কী? [৩৮তম বিসিএস লিখিত]
- ইরানের পারমাণবিক শক্তি অর্জনের প্রচেষ্টার প্রেক্ষিত ও বর্তমান অবস্থা আলোচনা করুন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ অপর কয়েকটি দেশের সাথে ২০১৬ সম্পাদিত চুক্তি ইরানের পারমাণবিক পরিকল্পনার কি প্রভাব ফেলবে? [৩৭তম বিসিএস লিখিত]
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি ক্ষমতা গ্রহণের আলোকেই ইরান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের ভবিষ্যৎ কী হতে পারে? [৩৭তম বিসিএস লিখিত]
- সিরিয়ায় সাম্প্রতিক রাজনৈতিক সংকটের কারণগুলো আলোচনা করুন। [৩৬তম বিসিএস লিখিত]

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- আপনি কি মনে করেন, মধ্যপ্রাচ্যের কুর্দী সমস্যা অপরিহার্য ভাবে একটি জাতীয়তাবাদী সমস্যা? সমস্যাটির ঐতিহাসিক ও বর্তমান প্রেক্ষাপটের আলোকে আপনার মতামত উপস্থাপন করুন। **[৩৫তম বিসিএস লিখিত]**
- গ্রিসের অর্থনৈতিক মন্দার কারণ সমূহ আলোচনা করুন। এ সংকট নিরসনে ইউরোপীয় ইউনিয়ন কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে আলোচনা করুন। **[৩৩তম বিসিএস লিখিত]**
- ইরানের পারমাণবিক ইস্যুকে কেন্দ্র করে কী কী ধরনের সংকট আসতে পারে বলে আপনি মনে করেন? জ্বালানি বাজারে এর কী প্রভাব পড়তে পারে? **[৩৩তম বিসিএস লিখিত]**
- আরব বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সাম্প্রতিক কালে গণতন্ত্রের দাবিতে গণ অসন্তোষ ও অভ্যুত্থানের কারণ সমূহ বর্ণনা করে বিস্তারিত লিখুন। **[৩১তম বিসিএস লিখিত]**
- মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়ায় প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রপতি বিলক্লিন্টনের অবদান সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। এই প্রেক্ষিতে মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়ার বর্তমান পরিস্থিতির উপর আলোকপাত করুন। **[২২তম বিসিএস লিখিত]**
- স্বাধীন সার্বভৌম ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা কতটুকু উজ্জ্বল? **[২১তম বিসিএস লিখিত]**
- পি. এল. ও এবং ইসরাইল চুক্তিটির বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করুন। **[১৫তম বিসিএস লিখিত]**

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

➢ **টীকা লিখুন:**

ক. দারফুর সংকট। [২৫তম বিসিএস লিখিত]

খ. প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র। [২০তম বিসিএস লিখিত]

গ. জেরিকো [১৫তম বিসিএস লিখিত]

Facebook Page
https://www.facebook.com/uttoronacademy

Facebook Group (BCS উত্তরণ)
https://www.facebook.com/groups/www.uttoron.academy

YouTube Channel
https://www.youtube.com/c/Uttoron

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

BCS অনলাইন ও অফলাইনের সমন্বয়ে গোছানো প্রস্তুতি (https://www.youtube.com/watch?v=MFKW8FSNnP0)

09666775566
www.uttoron.academy